Bdbangla.Org

প্রোফেসর শঙ্কুর ডায়রি

শঙ্কুর শনির দশা

৭ই জুন

আমাকে দেশবিদেশে অনেকে অনেক সময় জিজ্ঞাসা করেছে আমি জ্যোতিষে বিশ্বাস করি কিনা। প্রতিবারই আমি প্রশ্নটার একই উত্তর দিয়েছি—আমি এখনো এমন কোনো জ্যোতিষীর সাক্ষাৎ পাইনি যাঁর কথায় বা কাজে আমার জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বিশ্বাস জন্মাবে। কিন্তু আজ থেকে তিন মাস আগে অবিনাশবাবু যে জ্যোতিষীকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসেন, আজ আমি বলতে পারি যে তাঁর গণনা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেছে।

অবিশ্যি এটাও বলতে বাধ্য হচ্ছি যে গণনা না-ফললেই বেশি খুশি হতাম। তিনি বলেছিলেন, 'আজ থেকে তিন মাস পরে তোমার চরম সংকটের দিন আসছে। শনির দৃষ্টি পড়বে তোমার উপর। এমনই অবস্থায় পড়বে যে মনে হবে এর চেয়ে মৃত্যুও ভালো।' এ অবস্থা থেকে মুক্তি হবে কিনা জিগ্যেস করাতে বললেন, 'যে তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু, তাকে সংহার করতে পারলে তবেই মুক্তি।' আমি স্বভাবতই জিগ্যেস করলাম এ-শত্রুটি কে। তাতে তিনি ভারী রহস্যজনকভাবে একটু হেসে বললেন, 'তুমি নিজে।'

এই রহস্যের কিনারা এখনো হয়নি, কিন্তু সংকট যেটা এসেছে তার চেয়ে মৃত্যু যে ভালো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই সংকটের সূত্রপাত আজই পাওয়া একটি চিঠিতে। দু মাস আগে আমি ম্যাড্রিড থেকে একটা বিজ্ঞানী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ পাই। এই চিঠিতে সম্মেলনের উদ্যোক্তা বিশ্ববিখ্যাত প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ডি-সান্টস লিখেছিলেন, 'আমরা সকলেই বিশেষ করে তোমাকে চাই। তুমি না-এলে আমাদের সম্মেলন যথেষ্ট মর্যাদা লাভ করবে না। আশা করি তুমি আমাদের হতাশ করবে না।' এ-চিঠি পাবার তিনদিন পরে আমার বন্ধু জন সামারভিল ইংল্যান্ড থেকে আমাকে লেখে ম্যাড্রিড যাবার জন্য বিশেষ

অনুরোধ জানিয়ে। ডি-সান্টসকে হতাশ করার কোনো অভিপ্রায় আমার ছিল না। বছরে অন্তত একবার করে বিদেশে গিয়ে নানান দেশের নানান বয়সের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আমার নিজের চিন্তাকে সঞ্জীবিত করা—এটা আমার একটা অভ্যাসের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এর ফলেই বয়স সত্ত্বেও আমার দেহমন এখনো সজীব।

ম্যাড্রিডের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যে চিঠি লিখি, তারও জবাব আমি দু সপ্তাহের মধ্যেই পেয়ে যাই। ১৫ই জুন, অর্থাৎ আজ থেকে আট দিন পরে, আমার রওনা হবার কথা। এই অবস্থায় বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো আজকের চিঠি। মাত্র তিন লাইনের চিঠি। তার মর্ম হচ্ছে—ম্যাড্রিড বিজ্ঞানী সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ তাঁদের আমন্ত্রণ প্রত্যাহার করছেন। পরিষ্কার ভাষা। তাঁরা চান না যে আমি এ সম্মেলনে যোগদান করি। কারণ ? কারণ কিছু বলা নেই চিঠিতে।

এ থেকে কী বুঝতে হবে আমায় ? কী এমন ঘটতে পারে যার ফলে এঁরা আমাকে অপাঙক্তেয় বলে মনে করছেন ?

উত্তর আমার জানা নেই। কোনোদিন জানতে পারব কিনা তাও জানি না। আজ আর লিখতে পারছি না। দেহমন অবসন্ন। আজ এখানেই শেষ করি।

১০ই জুন

আজ সামারভিলের চিঠি পেলাম। সেটা অনুবাদ করলে এই দাঁড়ায়—

প্রিয় শঙ্কু,

তুমি দেশে ফিরেছ কিনা জানি না। ইনসব্রুকে গত মাসে তোমার বক্তৃতা সম্পর্কে কাগজে যা বেরিয়েছে সেটা পড়ে আমি দু'রাত ঘুমোতে পারিনি। নিঃসন্দেহে তুমি কোনো কঠিন মানসিক পীড়ায় ভুগছ, না হলে তোমার মুখ দিয়ে এ ধরনের কথা উচ্চারণ হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। আমি খবরটা পড়ে ইনসব্রুকে প্রোফেসর স্টাইনারকে ফোন করেছিলাম। তিনি বললেন বক্তৃতার পরে তোমার আর কোনো খবর জানেন না। আশঙ্কা হয় তুমি ইউরোপেই কোথাও আছ, এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছ। তা যদি না হয়, যদি এ চিঠি তোমার হাতে পড়ে, তাহলে পত্রপাঠ আমাকে টেলিগ্রামে তোমার কুশল সংবাদ জানাবে, এবং সেই সঙ্গে চিঠিতে তোমার এই অভাবনীয় আচরণের কারণ জানাবে। ইতি

তোমার

জন সামারভিল

পুনঃ—খবরটা কীভাবে টাইম্‌স-এ প্রকাশিত হয়েছে সেটা জানাবার জন্য এই কাটিং।

প্রথমেই বলে রাখি যে আমি ইনসব্রুকে গত মাসে কেন, কোনোকালেই যাইনি।

এইবার টাইম্‌স-এর খবরের কথা বলি। তাতে লিখছে—বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রোঃ টি· শঙ্কু গত ১১ই মে অস্ট্রিয়ার ইনসব্রুক শহরে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দেন। সভায় স্থানীয় এবং ইউরোপের অন্যান্য শহরের অনেক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক উপস্থিত ছিলেন। প্রোঃ শঙ্কু এইসব বৈজ্ঞানিকদের সরাসরি কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করেন। ফলে শ্রোতাদের মধ্যে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়, এবং অনেকেই বক্তাকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হন। জনৈক শ্রোতা একটি চেয়ার তুলে প্রোঃ শঙ্কুর দিকে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর ইনসব্রুক-নিবাসী পদার্থবিজ্ঞানী ডক্টর কার্ল গ্রোপিয়াস বক্তাকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করেন।

এই হল খবর। সামারভিল যেমন চেয়েছিল, আমি তার চিঠি পাওয়ামাত্র জবাব লিখে সে চিঠি নিজে ডাকে ফেলে এসেছি। কিন্তু তাতে আমি কী ফল আশা করতে পারি ? সামারভিল কি আমার কথা বিশ্বাস করবে ? কোনো সুস্থমস্তিষ্ক মানুষ কি বিশ্বাস করবে যে আমারই পরিবর্তে অবিকল আমারই মতো দেখতে একজন লোক ইনসব্রুকে গিয়ে এই বক্তৃতা দিয়ে আমার সর্বনাশ করেছে ? সামারভিলের সঙ্গে আমার তেত্রিশ বছরের বন্ধুত্ব ; সে-ই যদি বিশ্বাস না করে তো কে করবে ? খবরে বলেছে যে ডক্টর গ্রোপিয়াস আমাকে—অর্থাৎ এই রহস্যজনক দ্বিতীয় শঙ্কুকে—বাঁচান। গ্রোপিয়াসকে আমি চিনি। সাত বছর আগে বাগদাদে আন্তর্জাতিক আবিষ্কারক সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হল। স্বল্পভাষী অমায়িক ব্যক্তি বলে মনে হয়েছিল। সামারভিলের সঙ্গে তাঁকেও একটা চিঠি লিখে দিয়েছি।

নিজেকে এত অসহায় আর কখনো মনে হয়নি। আশঙ্কা হচ্ছে বাকি জীবনটা এই বিশ্রী কলঙ্কের বোঝা কাঁধে নিয়ে গিরিডি শহরে দাগী আসামির মতো কাটাতে হবে।

২১শে জুন

গ্রোপিয়াসের চিঠি—এবং অত্যন্ত জরুরী চিঠি। আজই ইনসব্রুক যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে।

টাইমস-এর বিবরণ যে অতিরঞ্জিত নয় সেটা গ্রোপিয়াসের চিঠিতে বুঝলাম। রুমানিয়ার মাইক্রো-বায়োলজিস্ট জর্জ পোপেস্কু নাকি আমার দিকে চেয়ার ছুঁড়ে মারেন। এনজাইম সম্পর্কে তাঁর মহামূল্য গবেষণাকে আমি নাকি অবাচীন বলে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই তিনি প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত

হয়ে পড়েন। গ্রোপিয়াস মঞ্চে আমার পাশেই বসে ছিল ; সে আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে এক পাশে সরিয়ে আমার প্রাণ বাঁচায়। চেয়ারটা একটা মাইক্রোফোনকে বিকল করে দিয়ে টেবিলের উপর রাখা জল ভর্তি দুটো কাঁচের গেলাসকে চুরমার করে দেয়। গ্রোপিয়াস লিখছে—

'তোমাকে আমি হাত ধরে টেনে সটান লাইব্‌নিৎস হলের বাইরে নিয়ে আসি। তুমি তখন এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলে যে তোমাকে ধরে রাখা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। বাইরে আমার গাড়ি অপেক্ষা করছিল ; কোনোরকমে তাতে তোমাকে তুলে আমি রওনা দিই। হাত ধরেই বুঝেছিলাম যে তোমার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। ইচ্ছা ছিল হাসপাতালে নিয়ে যাব, কিন্তু এক কিলোমিটার গিয়ে একটা চৌমাথায় ট্র্যাফিক লাইটের দরুন গাড়িটা থামার সঙ্গে সঙ্গে তুমি দরজা খুলে নেমে পালাও। তারপর অনেক খুঁজেও আর তোমার দেখা পাইনি। তোমার চিঠি পেয়ে বুঝলাম তুমি দেশে ফিরে গেছ। বিদেশী বৈজ্ঞানিক মহলে তোমার নামে যে কলঙ্ক রটেছে সেটা কীভাবে দূর হবে জানি না, তবে তুমি যদি একবার ইন্‌সব্রুকে আসতে পার, তাহলে ভালো ডাক্তারের সন্ধান দিতে পারি। তোমাকে পরীক্ষা করে যদি কোনো মস্তিষ্ক বা স্নায়ুর গণ্ডগোল ধরা পড়ে, তাহলে সেদিনকার ঘটনার একটা স্পষ্ট কারণ পাওয়া যাবে, এবং সেটা তোমার পক্ষে সুবিধাজনক হবে। অসুখ যদি হয়েই থাকে তাহলে তার চিকিৎসার কোনো ত্রুটি হবে না ইন্‌সব্রুকে।'

গ্রোপিয়াস ইন্‌সব্রুকের একটা কাগজ থেকে সেদিনকার ঘটনার একটা ছবিও পাঠিয়ে দিয়েছে। হন্তদন্ত গ্রোপিয়াস 'আমার' পিঠে হাত দিয়ে 'আমাকে' একপাশে সরিয়ে দিচ্ছেন। এই 'আমি'-র সঙ্গে আমার চেহারার কোনো পার্থক্য ছবিতে ধরতে পারলাম না। কেবল আমার চশমাটা—যেটা ছবিতে দেখছি প্রায় খুলে এসেছে—সেটার কাঁচ স্বচ্ছ না হয়ে ঘোলাটে বলে মনে হচ্ছে। 'আমার' ডাইনে বাঁয়ে টেবিলের পিছনে বসা ব্যক্তিদের মধ্যে আরো দুজনকে চেনা যাচ্ছে ; একজন হলেন রুশ বৈজ্ঞানিক ডক্টর বোরোডিন, আর অন্যজন ইন্‌সব্রুকেরই তরুণ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রোফেসর ফিংকেলস্টাইন। ফিংকেলস্টাইন তার হাত দুটো আমার দিকে বাড়িয়ে রয়েছে। হয়ত সেও আমাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল !

আজ সারাদিন ধরে গভীরভাবে চিন্তা করে বুঝেছি যে আমাকে ইন্‌সব্রুক যেতেই হবে। সেই জ্যোতিষীর কথা মনে পড়ছে। সে বলেছিল আমার এই পরম শত্রুটিকে সংহার না করলে আমার মুক্তি নেই। আমার মন বলছে এই ব্যক্তি এখনো ইন্‌সব্রুকেই রয়েছে আত্মগোপন করে। তার সন্ধানই হবে এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য।

সামারভিলকে লিখে দিয়েছি আমার সংকল্পের কথা। দেখা যাক্ কী হয়।

২৩শে জুন

আজ নতুন করে আমার মনে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

আমার ডায়রি খুলে গত তিন মাসের দিনলিপি পড়ে দেখছিলাম। মে মাসের তেসরা থেকে বাইশে পর্যন্ত দেখলাম কোনো এন্‌ট্রি নেই। সেটা অস্বাভাবিক নয়, কারণ উল্লেখযোগ্য কিছু না ঘটলে আমি ডায়রি লিখি না। কিন্তু খট্‌কা লাগছে এই কারণে যে ওই সময়টাতেই ইন্‌সব্রুকের ঘটনাটা ঘটেছিল। এমন যদি হয় যে আমি ইন্‌সব্রুকের নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম, ইন্‌সব্রুকে গিয়েছিলাম, ওই রকম বক্তৃতাই দিয়েছিলাম, এবং তারপর ইন্‌সব্রুক থেকে ফিরে এসেছিলাম—কিন্তু এই পুরো ঘটনাটাই আমার মন থেকে লোপ পেয়ে গেছে ? কোনো সাময়িক মস্তিষ্কের ব্যারাম থেকে কি এ-ধরনের বিস্মৃতি সম্ভব ? এটা অবিশ্যি খুব সহজেই যাচাই করা যেত ; দুঃখের বিষয় যে-দুটি ব্যক্তির সঙ্গে গিরিডিতে আমার প্রতিদিনই দেখা হয়, তাদের একজনও ওই সময়টা এখানে ছিলেন না। আমার চাকর প্রহ্লাদ গত দু মাস হল ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। যাকে বদলি দিয়ে গেছে, সেই ছেদিলালকে জিগ্যেস করেছিলাম। বললাম, 'গত মাসে আমি গিরিডি ছেড়ে কোথাও গিয়েছিলাম কিনা তোমার মনে আছে ?' সে চোখ কপালে তুলে বলল, 'আপনার স্মরোন থাকবে না তো হামার থাকবে কেইসন বাবু ?' আমারই ভুল হয়েছে ; এ জিনিস কাউকে জিগ্যেস করা যায় না। একজনকে জিগ্যেস করা যেত ; আমার বন্ধু অবিনাশবাবু। কিন্তু তিনি গত শুক্রবার চাইবাসা চলে গেছেন তাঁর ভাগনীর বিয়েতে।

ইন্‌সব্রুকের কোনো চিঠি আমার ফাইলের মধ্যে পাইনি। আশা করি আমার আশঙ্কা অমূলক।

আমি ৬ই জুলাই ইন্‌সব্রুক রওনা হচ্ছি। কপালে কী আছে কে জানে।

৭ই জুলাই

ইন্‌সব্রুক। বিকেল চারটে। ভিয়েনা থেকে ট্রেন ধরে সকাল দশটায় পৌঁছেছি এখানে। ছবি সমেত নকল-শঙ্কুর বক্তৃতা এখানকার কাগজে বেরোনোর যে কী ফল হয়েছে সেটা শহরে পদার্পণ করেই বুঝেছি। পরপর তিনটে হোটেলে আমাকে জায়গা দেয়নি। তৃতীয় হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠতে গিয়েছিলাম, ড্রাইভার মাথা নেড়ে না করে দিল। শেষটায় হাতে ব্যাগ নিয়ে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হেঁটে একটা গলির ভিতর ছোট্ট একটা সরাইখানা গোছের হোটেলে ঘর পেলাম। মালিকের পুরু চশমা দেখে মনে হল সে ভালো চোখে দেখে না, আমার বিশ্বাস সেই কারণেই আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি হল না। কিন্তু এভাবে গা ঢাকা দিয়ে থেকে কাজের বেশ অসুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে।

আজ রাত্রে সামারভিল আসছে। তাকে গিরিডি থেকেই ইন্‌সব্রুকে যাচ্ছি বলে

লিখেছিলাম, এবং এখানে এসেই টেলিফোন করেছি। তার জরুরী কাজ ছিল, তাও সে আসবে বলে কথা দিয়েছে।

গ্রোপিয়াসকে ফোন করেছিলাম। তার সঙ্গে আজ সাড়ে পাঁচটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। সে থাকে এখান থেকে দশ কিলোমিটার দূরে। বলেছে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে।

আরো একজনকে ফোন করা হয়ে গেছে এর মধ্যে : প্রোফেসর ফিংকেলস্টাইন। শুধু একজনের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনলে চলবে না, তাই ফিংকেলস্টাইনের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ভদ্রলোক বাড়ি ছিলেন না। চাকর ফোন ধরেছিল। আমার নম্বর দিয়ে দিয়েছি, বলেছি এলেই যেন ফোন করেন।

পাহাড়ে ঘেরা অতি সুন্দর শহর ইন্‌সব্রুক। যুদ্ধের সময় অনেক কিছুই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, এখন আবার সব নতুন করে গড়েছে। অবিশ্যি শহরের সৌন্দর্য উপভোগ করার মতো মনের অবস্থা আমার নেই। আমার এখন একমাত্র লক্ষ্য হল সেই জ্যোতিষীর গণনায় নির্ভর করে আমার মুক্তির পথ খোঁজা।

৭ই জুলাই, রাত সাড়ে দশটা

গ্রোপিয়াসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ঘটনাটা গুছিয়ে লিখতে চেষ্টা করছি।

পাঁচটার কিছু আগেই আমার এই অ্যাপোলো হোটেলের একটি ছোক্‌রা এসে খবর দিল হের্ প্রোফেসর শান্‌কোর জন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন হের ডকটর গ্রোপিয়াস। গাড়ির চেহারা দেখে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলাম। এককালে—অর্থাৎ অন্তত ত্রিশ বছর আগে—এটা হয়ত বেশ বাহারের গাড়ি ছিল, কিন্তু এখন রীতিমত জীর্ণদশা। গ্রোপিয়াস কি দরিদ্র, না কৃপণ ?

পাঁচটার মধ্যেই গ্রুনেওয়াল্ডস্ট্রাসে পৌঁছে গেলাম। এই রাস্তাতেই গ্রোপিয়াসের বাড়ি। একটা প্রাচীন গির্জা ও গোরস্থান পেরিয়ে গাড়িটা বাঁয়ে একটা গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে গেল। বাড়িটাও দেখলাম গাড়িরই মতো। গেট থেকে সদর দরজা পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে বাগান আগাছায় ভরে আছে, অথচ আসবার পথে অন্যান্য বাড়ির সামনের বাগানে ফুলের প্রাচুর্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেছে।

বাগদাদে গ্রোপিয়াসের চেহারা যা মনে ছিল, তার তুলনায় এবারে তাকে অনেক বেশি বিধ্বস্ত বলে মনে হল। সাত বছরে এত বেশি বুড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। হয়ত কোনো পারিবারিক দুর্ঘটনা ঘটে থাকবে। আমি এ ব্যাপারে কোনো অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করলাম না, কারণ তার নিজের স্বাস্থ্যের চেয়ে আমার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন বলে মনে হল।

বৈঠকখানায় দুজনে মুখোমুখি বসার পর গ্রোপিয়াস বেশ মিনিট দুয়েক ধরে

আমাকে পর্যবেক্ষণ করল। শেষটায় আমাকে বাধ্য হয়েই হালকাভাবে জিগ্যেস করতে হল, 'আমিই সেই শঙ্কু কিনা সেটা ঠাহর করতে চেষ্টা করছ ?'

গ্রোপিয়াস আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে যে-কথাটা বলল তাতে আমার ভাবনা দ্বিগুণ বেড়ে গেল।

'ডক্টর ওয়েবার আসছেন। তিনি তোমাকে পরীক্ষা করে দেখবেন। সেদিন তোমাকে ওয়েবারের ক্লিনিকেই নিয়ে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তুমি সে সুযোগ দাওনি। আশা করি এবারে তুমি আপত্তি করবে না। একমাত্র আমিই বিশ্বাস করি যে সেদিন তুমি অসুস্থ ছিলে বলেই এসব কথা বলতে পেরেছিলে। অন্য যারা ছিল তারা আমার সঙ্গে একমত নয়। তারা এখনো পেলে তোমাকে ছিঁড়ে খাবে। কিন্তু ওয়েবারের পরীক্ষার ফলে যদি প্রমাণ হয় যে তোমার মাথায় গোলমাল হয়েছে, তাহলে হয়ত এরা তোমাকে ক্ষমা করবে। শুধু তাই নয় ; চিকিৎসার সাহায্যে সুস্থ হয়ে তুমি হয়ত আবার তোমার সুনাম ফিরে পাবে।'

আমি অগত্যা বলতে বাধ্য হলাম যে গত চল্লিশ বছরে একদিনের জন্যেও আমি অসুস্থ হইনি। দৈহিক, মানসিক, কোনো ব্যাধির সঙ্গেই আমার পরিচয় নেই।

গ্রোপিয়াস বলল, 'তাহলে কি তুমি বলতে চাও যে এত সব নামকরা বৈজ্ঞানিক—শিমানোফ্‌স্কি, রিটার, পোপেস্‌কু, আল্‌টমান, স্ট্রাইখার, এমনকি আমি নিজে—এদের সম্বন্ধে তুমি এত নীচ ধারণা পোষণ কর ?'

আমি যথাসম্ভব শান্তভাবে বললাম, 'গ্রোপিয়াস, আমি বিশ্বাস করি যে আমারই মতো দেখতে আরেকজন লোক রয়েছে, যে নিজে বা অন্য কোনো লোকের প্ররোচনায় আমাকে অপদস্থ করার জন্য এইসব করছে।'

'তাহলে সে লোক এখন কোথায় ? সেদিন আমার গাড়ি থেকে নেমে সে শহর থেকে কি ভ্যানিশ করে গেল ? তোমার না হয় পাসপোর্ট ছিল, টিকিট ছিল, তুমি সোজা প্লেন ধরে দেশে ফিরে গেছ, কিন্তু একজন প্রতারকের পক্ষেতোহঠাৎ শহর থেকে পালানো এত সহজ নয়।'

আমি বললাম, 'আমার বিশ্বাস সে লোক এই শহরেই আছে। এমনও হতে পারে যে সে একজন অখ্যাত বৈজ্ঞানিক, অনেক জায়গায় আমাকে দেখেছে, আমার বক্তৃতা শুনেছে। বোঝাই যাচ্ছে আমার সঙ্গে তার কিছুটা সাদৃশ্য আছে, বাকিটা সে মেক-আপের সাহায্যে পুষিয়ে নিয়েছে।'

গ্রোপিয়াসের চাকর হট চকোলেট দিয়ে গেল। চাকরের সঙ্গে সঙ্গে একটা কুকুরও এসে ঘরে ঢুকেছে, বুঝলাম সেটা জাতে ডোবারমান পিন্‌শার। কুকুরটা আমাকে দেখে লেজ নাড়তে নাড়তে কাছে এসে আমার প্যান্ট শুঁকতে লাগল। কিন্তু তার পরেই দেখলাম সে আমার মুখের দিকে চেয়ে বার তিনেক গর্‌র গর্‌র

শব্দ করল। গ্রোপিয়াস 'ফ্রিকা, ফ্রিকা' বলে দুবার ধমক দিতেই সে যেন বিরক্ত হয়ে আমার কাছ থেকে সরে গিয়ে কিছু দূরে কার্পেটের উপর বসে পড়ল।

'তুমি এখানে এসেছ বলে আর কেউ জানে কি ?' গ্রোপিয়াস প্রশ্ন করল।

আমি বললাম, 'ইন্‌সব্রুকে আমার জানা বলতে আর একজনই আছেন। তাঁকে এসে ফোন করেছিলাম, কিন্তু তিনি বাড়ি ছিলেন না। তাঁর চাকরকে আমার ফোন নম্বর দিয়ে দিয়েছি।'

'কে তিনি ?'

আমি একটু হেসে বললাম, 'তিনিও প্রোফেসর শঙ্কুর বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলেন। তোমার পাঠানো খবরের কাগজের ছবিতে তাঁকে দেখলাম।'

গ্রোপিয়াস ভ্রূকুঞ্চিত করল।

'কার কথা বলছ তুমি ?'

'প্রোফেসর ফিংকেলস্টাইন।'

'আই সী।'

খবরটা শুনে গ্রোপিয়াসকে তেমন প্রসন্ন বলে মনে হল না। প্রায় আধ মিনিট চুপ থাকার পর আমার দিকে সোজা তাকিয়ে বলল, 'ফিংকেলস্টাইনের গবেষণা সম্বন্ধে সেদিন তুমি কী বলেছিলে সেটা মনে আছে ?'

আমি বাধ্য হয়েই মাথা নেড়ে না বললাম।

'যদি মনে থাকত তাহলে আর তাকে ফোন করতে না। তুমি বলেছিলে একটি তিন বছরের শিশুও তার চেয়ে বেশি বুদ্ধি রাখে।'

আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। খুব ভালো করেই জানি এই উন্মাদ বক্তৃতার জন্য আমি দায়ী নই, কিন্তু এখানকার লোকের যদি সত্যিই ধারণা হয়ে থাকে যে এই প্রতারকই হচ্ছে আসল শঙ্কু, তাহলে আমার বিপদের শেষ নেই। গ্রোপিয়াস ছাড়া কি তাহলে আমি কারুর উপরেই ভরসা রাখতে পারব না ?

একটা গাড়ির শব্দ।

'ওই বোধহয় ওয়েবার এল,' বলল গ্রোপিয়াস।

ডাক্তারকে আমার ভালো লাগল না। জার্মানির তুলনায় অস্ট্রিয়ার লোকেদের মধ্যে যে মোলায়েম ভাব থাকে, সেটা এর মধ্যেও আছে, তবে সেটার মাত্রাটা যেন একটু অস্বস্তিকর রকম বেশি। মুখে লেগে থাকা সরল হাসিটাও কেন জানি কৃত্রিম বলে মনে হয়।

ওয়েবার আধ ঘণ্টা ধরে আমাকে নানারকম প্রশ্ন করে পরীক্ষা করল, আমিও সব সহ্য করলাম। যাবার সময় বলল, 'গ্রোপিয়াস তোমাকে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে, কাল সকালে গটফ্রীট্‌স্ট্রাসেতে আমার ক্লিনিকে এস, সেখানে আমার যন্ত্রপাতি আছে। তোমাকে সুস্থ করাটা আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে রইল।'

আমি মনে মনে বললাম—তোমার চেয়ে অন্তত দশগুণ বেশি সুস্থ আমি। তুমি এক মাস নখ কাটনি, তোমার ঠোঁটে সিগারেটের কাগজ লেগে আছে, তোমার জিভের দোষে কথা জড়িয়ে যায়—তুমি করবে আমার মাথার ব্যামোর চিকিৎসা ?

ওয়েবারকে গাড়িতে তুলে দিতে গ্রোপিয়াস ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, ওর দেরি দেখে আমি ঘরটা ঘুরে দেখছিলাম, তাকের উপর ফোটো অ্যালবাম দেখে

পাতা উলটে দেখি একটা ছবিতে আমি রয়েছি। এ ছবি আমার কাছে নেই, তবে এটা তোলার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। বাগদাদের হোটেল স্প্লেনডিডের সামনে তোলা। আমি, গ্রোপিয়াস আর রুশ বৈজ্ঞানিক কামেনস্কি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি।

'তোমার সঙ্গে জিনিসপত্র কী আছে?' গ্রোপিয়াস ঘরে ফিরে এসে প্রশ্ন করল।

'কেন বল তো?'

'আমার মনে হয় তুমি আমার এখানে চলে এস। তোমার নিরাপত্তার জন্যই আমি এই প্রস্তাব করছি। আমার বড় গেস্টরুম আছে, তুমি এর আগেও সেখানে থেকে গেছ—যদিও তোমার সেটা মনে থাকার কথা নয়। মে মাসে যখন এসেছিলে তখন তুমি আমারই আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলে।'

ব্যাপারটা অসম্ভব জানলেও মাথাটা কেমন জানি গুলিয়ে উঠছিল। আমি জিগ্যেস করলাম, 'আমাকে কি তুমিই নেমন্তন্ন করেছিলে?'

গ্রোপিয়াস এর উত্তরে উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে একটা ফাইল নিয়ে এল। তাতে অন্য চিঠির মধ্যে আমার দুখানা চিঠি রয়েছে। অবিকল আমার চিঠির কাগজ, আমার সই, আমার অলিভেটি টাইপরাইটারের হরফ। প্রথম চিঠিটায় লিখেছি যে মে মাসে এমনিতেই আমি ইউরোপ যাচ্ছি, কাজেই ইন্সব্রুকে যাওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই। দ্বিতীয় চিঠিটায় জানিয়েছি কবে পৌঁছচ্ছি।

রহস্য ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে এবং সেই সঙ্গে আমার সংকটাপন্ন অবস্থাটাও ক্রমশ: স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এখানের হোটেলেই যখন আমাকে ঢুকতে দেয়নি, তখন যে-লোককে আমি প্রকাশ্য বক্তৃতায় নাম ধরে অপমান করেছি, আমার প্রতি তার মনোভাব কী হবে সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

কিন্তু গ্রোপিয়াসকে বলতে হল যে এখুনি তার বাড়িতে এসে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব না।

'আজ রাত্রে আমার বন্ধু সামারভিল লন্ডন থেকে আসছে। কাল যদি আমরা দুজনে একসঙ্গে তোমার বাড়িতে এসে উঠি?'

'সামারভিল কে?' একটু সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করল গ্রোপিয়াস। আমি সামারভিলের পরিচয় দিয়ে বললাম, 'সে আমার বিশিষ্ট বন্ধু; ঘটনাটা শুনে সে বিশেষ চিন্তিত।'

'তোমার কি ধারণা এখানে এসে তোমাকে দেখলে তার চিন্তা দূর হবে?'

আমি কোনো উত্তর না দিয়ে গ্রোপিয়াসের দিকে চেয়ে রইলাম। আমি জানি ও কী বলবে, এবং ঠিক তাই বলল।

'তোমার বন্ধুও তোমার চিকিৎসার জন্য আমারই মতো ব্যস্ত হয়ে উঠবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।'

আমি হোটেলে ফিরেছি সন্ধ্যা সাতটায়। ফিংকেলস্টাইনের কাছ থেকে কোনো ফোন আসেনি। ঘরে গিয়ে চেয়ারে বসে আজকের আশ্চর্য ঘটনাগুলো নিয়ে চিন্তা করছি এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। সামারভিল। রেলস্টেশন থেকে ফোন করছে। বললাম, 'কী হল, তুমি আসছ না?'

'আসছি তো বটেই, একটা উৎকণ্ঠা হচ্ছিল তাই ফোনটা করলাম।'

'কী ব্যাপার?'

'তুমি অক্ষত আছ কিনা সেটা জানা দরকার।'

'অক্ষত এবং সম্পূর্ণ সুস্থ।'

'ভেরি গুড। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি। অনেক খবর আছে।'

আমার সম্বন্ধে সামারভিল যে কতটা উদ্বিগ্ন সেটা এই টেলিফোনেই বুঝতে পারলাম। কিন্তু কী খবর আনছে সে?

আমার ঘরে যদিও দুটো খাট রয়েছে, কিন্তু ঘরটা এত ছোট যে আমি সামারভিলের জন্য পাশের ঘরটা বন্দোবস্ত করব বলে ঠিক করেছিলাম। যখন বাড়ি ফিরেছি তখনও ঘরটা খালি ছিল। হোটেলের মালিককে সেটা সম্বন্ধে বলব বলে ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি সে-ঘরে বাতি জ্বলছে এবং আধ-খোলা দরজা দিয়ে কড়া চুরুটের গন্ধ আসছে। আর কোনো খালি ঘর আছে কি? খোঁজ নিয়ে জানলাম নেই। অগত্যা আমার এই ছোট ঘরেই সামারভিলকে থাকতে হবে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সামারভিল এসে পড়ল। ইতিমধ্যে কখন যে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, সেটা খেয়াল করিনি; সেটা বুঝলাম সামারভিলকে ভিজে বর্ষাতি খুলতে দেখে। বলল, 'আগে কফি আনাও, তারপর কথা হবে।'

কথাটা বলে সেও গ্রোপিয়াসের মতো মিনিটখানেক ধরে আমার দিকে চেয়ে রইল। এ ব্যাপারটা প্রায় আমার গা-সওয়া হয়ে যাচ্ছে, যদিও সামারভিলের প্রতিক্রিয়া হল অন্যরকম।

'তোমার চাহনিতে কোনো পরিবর্তন দেখছি না শঙ্কু। আমার বিশ্বাস তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ।'

আমি এতদিনে নিশ্চিন্তির হাঁপ ছাড়লাম।

কফি আসার পর সামারভিলকে আজকের সারাদিনের ঘটনা বললাম। সব শুনে সে বলল, 'আমি গত কদিনে পুরানো জার্মান বৈজ্ঞানিক পত্রিকা ঘেঁটে গ্রোপিয়াসের কয়েকটা প্রবন্ধ আবিষ্কার করেছি। গত দশ বছরের মধ্যে সে কোনো লেখা লেখেনি, কিন্তু তার আগে লিখেছে।'

'কী সম্বন্ধে লিখেছে ?'

'তার ব্যর্থতা সম্বন্ধে।'

'কীরকম ? কিসের ব্যর্থতা ?'

এর উত্তরে সামারভিল যা বলল তাতে যে আমি শুধু অবাকই হলাম তা নয় ; এর ফলে সমস্ত ঘটনাটা একটা নতুন চেহারা নিয়ে উপস্থিত হল আমার সামনে। সে বলল—

'তোমার তৈরি অমনিস্কোপ, তোমার ধন্বন্তরি ওষুধ মিরাকিউরল, তোমার লিঙ্গুয়াগ্রাফ, তোমার এয়ারকন্ডিশনিং পিল—প্রত্যেকটি জিনিসই গ্রোপিয়াসের মাথা থেকে বেরিয়েছিল। দুঃখের বিষয় প্রতিবারই সে জেনেছে যে তার ঠিক আগেই তুমি এগুলোর পেটেন্ট নিয়ে বসে আছ। অর্থাৎ প্রতিভার দৌড়ে প্রতিবারই সে তোমার কাছে অল্পের জন্য হার মেনেছে। দশ বছর আগে তার শেষ প্রবন্ধে সে অত্যন্ত আক্ষেপ করে বলেছে যে কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য খ্যাতিলাভের ব্যাপারটা নেহাতই আকস্মিক। প্রাচীন পুথিপত্র ঘেঁটে ও এর নজিরও দেখিয়েছে—যেমন মাধ্যাকর্ষণের ব্যাপারে খ্যাতি হল নিউটনের, কিন্তু তারও ত্রিশ বছর আগে ইতালির বৈজ্ঞানিক ফ্রাতেল্লি নাকি এই মাধ্যাকর্ষণের কথা লিখে গেছেন।'

আমি বললাম, 'ঠিক সেইভাবে বেতারের আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমাদের জগদীশ বোসের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন মার্কনি।'

'এগজ্যাক্টলি,' বলল সামারভিল। 'কাজেই গ্রোপিয়াস যদি তোমার প্রতি বিরূপভাব পোষণ করে তাহলে আশ্চর্য হয়ো না।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু এতে দ্বিতীয় শঙ্কুর রহস্যের সমাধান হচ্ছে কীভাবে ?'

প্রশ্নটা করাতে সামারভিল গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'তোমার সঙ্গে গ্রোপিয়াসের শেষ দেখা হয়েছিল বাগদাদে সাত বছর আগে। তারপর থেকে সে আর কোনো বিজ্ঞানী সম্মেলনে যায়নি। এই প্রথম গত মে মাসে ইন্‌সব্রুকে তারই উদ্যোগে আয়োজিত বিজ্ঞানী সম্মেলনে সে যোগদান করে। আর—'

আমি সামারভিলকে বাধা দিয়ে বললাম, 'কিন্তু এই সম্মেলন থেকে আমি কোনো চিঠি পাইনি।'

'সে তো পাবেই না। কিন্তু গ্রোপিয়াস নিশ্চয়ই বলেছে যে সে তোমাকে ডেকেছে। এমনকি সে তোমার সই সমেত চিঠিও নিশ্চয়ই তার ফাইলে রেখেছে।'

আমাকে বলতেই হল যে সে-চিঠি আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি।

'তার সঙ্গে এর আগে তোমার চিঠি লেখালেখি হয়েছে ?' সামারভিল প্রশ্ন করল।

আমি বললাম, 'বাগদাদে ওর সঙ্গে আলাপ হবার পর আমি ওকে দুবার চিঠি লিখেছি, আর পর পর পাঁচ বছর নববর্ষের সম্ভাষণ জানিয়ে কার্ড পাঠিয়েছি।'

সামারভিল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। তারপর বলল, 'তোমার সঙ্গে চেহারার মিল আছে এমন কোনো লোক নিশ্চয়ই জোগাড় করেছে গ্রোপিয়াস। যেটুকু তফাত সেটুকু মেকআপের সাহায্যে ম্যানেজ করেছে, আর বক্তৃতার বিষয়টা তাকে আগে থেকেই শিখিয়ে নিয়েছে। টাকার লোভে এ-কাজটা অনেকেই করতে রাজি হবে। এই দ্বিতীয় শঙ্কুর তো কোনো দায়-দায়িত্ব নেই ; সে ফরমাশ খেটে টাকা পেয়ে খালাস, এদিকে আসল শঙ্কুর যা সর্বনাশ হবার তা হয়েই গেল, আর গ্রোপিয়াসেরও প্রতিশোধ নেওয়া হয়ে গেল। ভালো কথা, তোমার বক্তৃতার কোনো রেকর্ডিং গ্রোপিয়াসের কাছে থাকতে পারে ?'

প্রশ্নটা শুনেই আমার মনে পড়ে গেল বাগদাদে গ্রোপিয়াসকে একটা ছোট্ট টেপরেকর্ডার সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে দেখেছি। আমি বললাম, 'সেটা খুবই সম্ভব। শুধু তাই না, আমার একটা ভাল রঙিন ছবিও তার কাছে আছে। আমি আজই দেখেছি।'

সামারভিল একটা আক্ষেপসূচক শব্দ করে বলল, 'মুশকিলটা কী জান ? যাকে শঙ্কু সাজিয়েছে তাকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। অথচ গ্রোপিয়াসের শয়তানি প্রমাণ করতে গেলে এই দ্বিতীয় শঙ্কুর প্রয়োজন।'

এই হোটেলে ঘরে টেলিফোন নেই। দোতলার তিনজন বাসিন্দার জন্য একটিমাত্র টেলিফোন রয়েছে প্যাসেজে। যদি এক নম্বরের জন্য ফোন আসে তাহলে একবার একবার করে রিঙ হতে থাকে, দুই নম্বর হলে ডবল রিং, আর তিন হলে তিনবার। টেলিফোন দুই দুই করে বাজছে দেখে বুঝলাম আমারই ফোন।

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে ফোন ধরলাম।

'হ্যালো !'

'প্রোফেসর শঙ্কু কথা বলছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নাম ফিংকেলস্টাইন।'

আমি বৃথা বাক্যব্যয় না করে আসল প্রসঙ্গে চলে গেলাম।

'গত মে মাসে এখানে একটা বিজ্ঞানী সভায় তুমি বোধহয় উপস্থিত ছিলে। কাগজে তোমার ছবি দেখলাম।'

'তুমি কি তোমার চশমা হারিয়েছ ?'

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের কী জবাব দিতে হবে ভাবছি, সেই ফাঁকে ফিংকেলস্টাইন আরেকটা প্রশ্ন করে বসল।

'তোমার চশমার কাঁচ কি ঘোলাটে, না স্বচ্ছ ?'

আমি বললাম, 'স্বচ্ছ। এবং সে চশমা আমার কাছেই আছে, কোনোদিন হারায়নি।'

'আমার তাই বিশ্বাস। যাই হোক, বিজ্ঞান-সভায় যে-শঙ্কু বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তিনি ঘর থেকে বেরোবার সময় তাঁর চশমাটা খুলে মেঝেতে পড়ে যায়। সেটা আমি তুলে নিই। শুধু চশমা নয়, তার সঙ্গে একটি জিনিস আটকে ছিল, সেটাও আমার কাছে আছে।'

'কী জিনিস ?'

'সেটা তুমি এলে দেখাব। ওটা না পেলে কিন্তু আমারও ধারণা হত যে যিনি বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি আসল শঙ্কু, নকল নন।'

কথাটা শুনে আমার হৃৎকম্প শুরু হয়ে গেছে। বললাম, 'কখন তোমার সঙ্গে দেখা করা যায় ?'

ফিংকেলস্টাইন বলল, 'এখন রাত হয়ে গেছে, আর দিনটাও ভালো না। কাল সকাল সাড়ে আটটায় আমার বাড়িতে এসো। বেশি সকাল হয়ে যাচ্ছে না তো?'

'না, না। ঠিক সাড়ে আটটায় যাবো। আমার সঙ্গে আমার ইংরেজ বন্ধু জন সামারভিলও থাকবে।'

'বেশ, তাকে নিয়ে এস। তখনই কথা হবে। অনেক কিছু বলার আছে।'

ফোন রেখে দিলাম। সামারভিল পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। দুজনে আবার ঘরে ফিরে এলাম। সামারভিল দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'তিন নম্বরে যে আছে তাকে চেনো ?'

'কেন বল তো? লোকটি আজ সন্ধ্যায় এসেছে।'

'ভদ্রলোকের একটু বেশিরকম কৌতূহল বলে মনে হল। চুরুটের গন্ধ পেয়ে পিছনে ফিরে দেখি দরজাটা এক ইঞ্চি ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার ফোনের কথা শোনার তার এত আগ্রহ কেন ?'

এর উত্তর আমি জানি না। লোকটা কে তাও জানি না। আশা করি কাল ফিংকেলস্টাইনের সঙ্গে কথা বললে রহস্য অনেকটা পরিষ্কার হবে।

এখন রাত এগারোটা। বৃষ্টি হয়ে চলেছে। সামারভিল শুয়ে পড়েছে।

৯ই জুলাই

কাল ডায়রি লিখতে পারিনি। লেখার মতো অবস্থা ছিল না। সেই জ্যোতিষীর গণনা শেষ পর্যন্ত ফলেছে। একটা কথা মানতেই হবে ; শয়তানিতে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে বৈজ্ঞানিককে টেক্কা দেওয়া অসম্ভব। যাক গে, আপাতত কালকের অসামান্য ঘটনাগুলো বর্ণনায় মনোনিবেশ করি।

সকাল সাড়ে আটটায় ফিংকেলস্টাইনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। টেলিফোন ডিরেক্টরিতে ফিংকেলস্টাইনের ঠিকানা দেখে সামারভিল বলল, 'হেঁটে যাওয়া যেতে পারে। বেশি দূর না—আধ ঘণ্টায় পৌঁছে যাব।' সামারভিলের চেনা শহর ইনসব্রুক। তা ছাড়া আমাকে ট্যাক্সিতে তোলার বিপদের কথাও ও জানে।

আটটায় বেরিয়ে পড়লাম। প্রাচীন শহরের ভিতর দিয়ে রাস্তা। সামারভিল দেখলাম অলিগলির মধ্যে দিয়ে শর্টকাটগুলোও জানে। একটা গলি পেরিয়ে খোলা জায়গায় পড়তেই দেখি ডাইনে ছবির মতো সুন্দর সিল নদী বয়ে যাচ্ছে। আমরা নদীর ধার ধরে কিছু দূর গিয়ে বাঁয়ে একটা পার্ক ছাড়িয়ে আবার বাঁ দিকেই ঘুরে একটা নির্জন রাস্তায় পড়লাম। এটাই রোজেনবাউম আলে অর্থাৎ ফিংকেলস্টাইনের বাড়ির রাস্তা। এগারো নম্বর খুঁজে পেতে কোনোই অসুবিধা হল না।

ছোট অথচ ছবির মতো সুন্দর বাড়ি। সামনেই বাগান, তাতে নানা রঙের ফুল ফুটে রয়েছে, আর তারই মধ্যে সামনের দরজার ডান পাশে একটা আপেল গাছ দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মতো।

আমরা এগিয়ে গিয়ে দরজার বেল টিপলাম। একজন প্রৌঢ় চাকর এসে দরজা খুলে দিল। আমাকে দেখেই তার মুখে হাসি ফুটে ওঠাটা কেমন যেন অস্বাভাবিক লাগল।

'আসুন ভেতরে....আপনি কিছু ফেলে গেছেন বুঝি ?'

আমার বুকের ভিতরে যেন একটা হাতুড়ি পড়ল।

'প্রোফেসর ফিংকেলস্টাইন আছেন ?' সামারভিলের গলার স্বরে সংশয়।

'মনিব তো এখনো ঘরেই আছেন।'

'কোথায় ঘর ?'

'দোতলায় উঠেই ডান দিকে। ইনি তো একটু আগেই—'

তিন ধাপ করে সিঁড়ি উঠে দোতলায় পৌঁছে গেলাম। ডানদিকের ঘরের দরজা খোলা। সামারভিল তার লম্বা পা ফেলে আগেই ঢুকে 'মাই গড !' বলে দাঁড়িয়ে গেল।

এটা ফিংকেলস্টাইনের স্টাডি। মেহগানির টেবিলের সামনে অদ্ভুতভাবে মাথাটাকে পিছনে চিতিয়ে চেয়ারে বসে আছে ফিংকেলস্টাইন, তার হাত দুটো চেয়ারের দুপাশে ঝুলে রয়েছে।

এগিয়ে গিয়ে দেখি, যা অনুমান করেছি তাই। ফিংকেলস্টাইনের মুখের দিকে চাওয়া যায় না। তাকে গলা টিপে মারা হয়েছে। কণ্ঠনালীর দুপাশে আঙুলের দাগ এখনো টাটকা। এই দৃশ্য দেখে ফিংকেলস্টাইনের চাকর যেটা করল সেটাও মনে

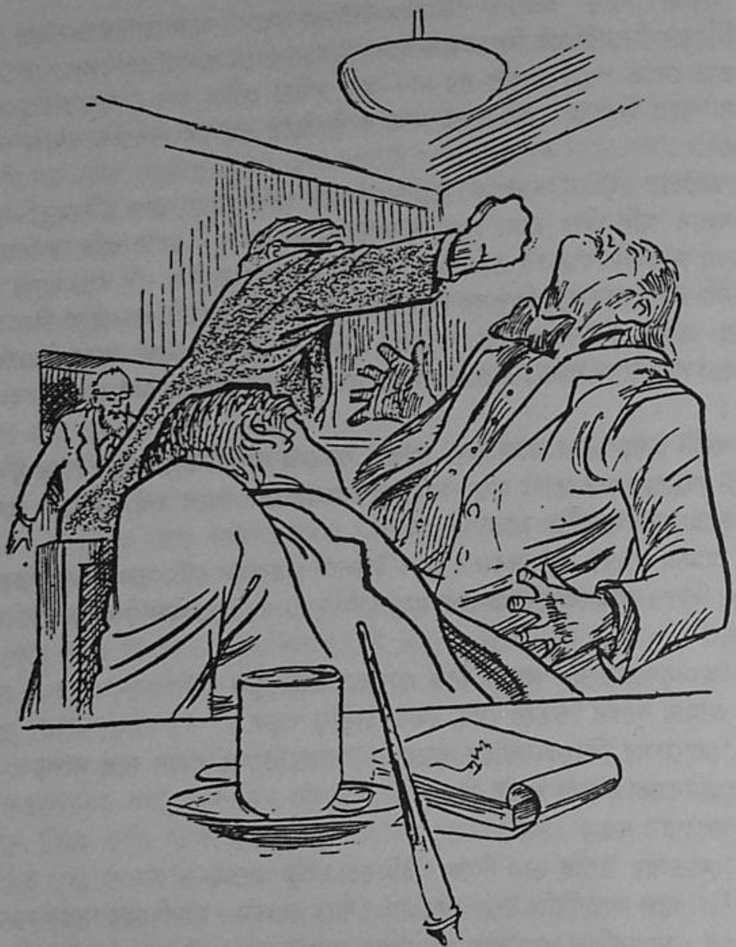

রাখার মতো। একটা অস্ফুট চিৎকার করে আমার দিকে একটা বিস্ফারিত দৃষ্টি দিয়ে সে টেবিলের উপর রাখা টেলিফোনটার উপর হুমড়ি দিয়ে পড়ল। তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট ; সে পুলিশে খবর দেবে।

সামারভিল যেটা করল সেটা অবিশ্যি তার উপস্থিত বুদ্ধির পরিচায়ক। সে এক ঘুঁষিতে ভৃত্যটিকে ধরাশায়ী করল। দেখে বুঝলাম, ভৃত্য অজ্ঞান।

'তুমি ফাঁদে পড়েছ, শঙ্কু !' রুদ্ধশ্বাসে বলল সামারভিল। 'মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করতে হবে।'

'কিন্তু ওটা কী ?'

আমার চোখ চলে গেছে টেবিলের উপর রাখা একটা প্যাডের দিকে। তাতে একটিমাত্র কথা লেখা রয়েছে লাল পেনসিলে—'এর্সটে'। অর্থাৎ ফার্স্ট, প্রথম। আরো যে কিছু লেখার ইচ্ছা ছিল ফিংকেলস্টাইনের সেটা কথাটার পরেই পেনসিলের দাগ থেকে বোঝা যাচ্ছে। পেনসিলটা পড়ে রয়েছে টেবিলের পাশে মেঝেতে।

যা করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। 'এর্সটে' লিখে কী বোঝাতে চেয়েছিল ফিংকেলস্টাইন ? প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয়—এইভাবে বোঝানো যেতে পারে এমন কী আছে ঘরের মধ্যে ? বইয়ের তাক বোঝাতে পারে কি ? মনে হয় না। আমি বুঝতে পারছি কী জিনিসের অবস্থান বোঝাতে চেয়েছিল ফিংকেলস্টাইন। আমার চশমা।

জিনিসটা পাওয়া গেল টেবিলের প্রথম—অর্থাৎ ওপরের দেরাজটা খুলে। কাগজপত্র কলম পেনসিল ইত্যাদির মধ্যে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স রাখা হয়েছে, তার ঢাকনাতে জার্মান ভাষায় লেখা 'শঙ্কুর চশমা এবং চুল'। বাক্সটা নিয়ে আমরা দুজনে চম্পট দিলাম। ভৃত্য এখনো বেহুঁশ।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় লক্ষ করলাম জুতোর ছাপ ; ওঠার সময় তাড়াতাড়িতে চোখে পড়েনি।

বাইরেও রয়েছে সেই ছাপ ; দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেট ছাড়িয়ে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। আসার ছাপ, যাওয়ার ছাপ, দুরকমই আছে। কাল রাত্রের বৃষ্টিই অবিশ্যি এর জন্য দায়ী।

আমরা ছাপটা অনুসরণ করে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখি সেটা রাস্তা ছেড়ে ঘাসের উপর উঠে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও আমরা পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম। দশ মিনিট এদিকে ওদিকে খুঁজেও যখন দ্বিতীয় শঙ্কুর কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না, তখন বাধ্য হয়ে হোটেলে ফিরে আসতে হল। মালিক আমাকে দেখেই বলল, 'তোমার ফোন এসেছিল। ডক্টর গ্রোপিয়াস। তোমাকে অবিলম্বে টেলিফোন করতে বলেছেন।'

দোতলায় উঠে দেখি আমাদের পাশের ঘর আবার খালি হয়ে গেছে।

খাটে বসে পকেট থেকে বাক্সটা বার করলাম। খুলে দেখি শুধু চশমা নয়, তার সঙ্গে একটা ছোট্ট খামও রয়েছে। চশমাটা ঠিক আমার চশমারই মতো, কেবল কাঁচটা গ্রে রঙের। খামটা খুলতে তার থেকে একটা চিরকুট বেরোল, তাতে লেখা—'লাইব্‌নিৎস হলে বিজ্ঞান সভায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রোফেসর শঙ্কুর চোখ থেকে খুলে পড়া চশমা-সংলগ্ন নাইলনের চুল।'

নাইলনের চুল ?

খামের ভিতরেই ছিল চুলটা। দেখতে ঠিক পাকা চুলেরই মতো বটে, কিন্তু সেটা যে কৃত্রিম তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই চুল থেকেই ফিংকেলস্টাইন বুঝে ফেলেছিল যে বক্তৃতাসভার শঙ্কু আসল-শঙ্কু নয়।

কিন্তু আমার এই সংকটে ফিংকেলস্টাইনের সাহায্য লাভের আর কোনো উপায় নেই।

ঘরের দরজা বন্ধ ছিল ; তাতে হঠাৎ টোকা পড়াতে দুজনেই চমকে উঠলাম। এ সময় আবার কে এল ?

খুলে দেখি গ্রোপিয়াস।

সামারভিলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে গ্রোপিয়াসকে বসতে বললাম, কিন্তু সে বসল না। দরজার মুখে দাঁড়ানো অবস্থাতেই বলল, 'আজ তোমাকে নিয়ে যাব বলেছিলাম, কিন্তু আজ ওয়েবারের একটু অসুবিধে আছে। তা ছাড়া আমার বাড়িতে আজ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আমার এক চাকর ফ্রান্‌ৎস কাল রাত্তিরে থ্রম্বোসিসে মারা গেছে। আজ তার শেষকৃত্য ; আমায় উপস্থিত থাকতে হবে।'

এর উত্তরে আমাদের কিছু বলার নেই ; কয়েক মুহূর্ত বিরতির পর গ্রোপিয়াসই কথা বলল। এবার সে একটা প্রশ্ন করল।

'ফিংকেলস্টাইন মারা গেছে জান কি ?'

আমি যে ফিংকেলস্টাইনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম সেটা পাশের ঘর থেকে একজন লোক শুনেছিল সেটা মনে আছে। সে যদি গ্রোপিয়াসের অনুচর হয়ে থাকে তাহলে আমার সাড়ে আটটায় অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা গ্রোপিয়াসের কানে পৌঁছেছিল নিশ্চয়ই। তবুও আমি অজ্ঞতা ও বিস্ময়ের ভান করে বললাম, 'সে কি ! কখন ?'

'আজ সকালে। অ্যাকাডেমি অফ সায়ান্স থেকে ফোন করেছিল এই কিছুক্ষণ আগে। ওর চাকর আনটন প্রথমে পুলিশে খবর দেয়, তারপর অ্যাকাডেমির প্রেসিডেন্ট গ্রোসমানকে ফোন করে।'

আমরা দুজনে চুপ। গ্রোপিয়াস এক পা এগিয়ে এল।

'আনটন একজন লোকের কথা বলেছে—গায়ের রঙ ময়লা, মাথায় টাক, দাড়ি আছে, চশমা আছে ; আজ সকালে ফিংকেলস্টাইনের বাড়িতে গিয়েছিল। তার নামটাও বলেছিল আনটন।'

'বর্ণনা যখন আমার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, তাহলে নামটাও মিলতে পারে,' আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম। 'আর সেটাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, কারণ সকালে সত্যিই গিয়েছিলাম ফিংকেলস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে সামারভিল ছিল। গিয়ে দেখি ফিংকেলস্টাইন মৃত। তাকে টুঁটি টিপে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।'

'প্রোফেসর শঙ্কু,' রক্ত জল করা গলায় বলল গ্রোপিয়াস, 'বক্তৃতার ভাষার সাহায্যে বৈজ্ঞানিকদের আক্রমণ করা এক জিনিস, আর সরাসরি তাদের একজনকে আক্রমণ করে তাকে হত্যা করা আরেক জিনিস। তুমি নিজেই যখন বলছ তোমার মস্তিষ্কে কোনো গোলমাল নেই, তখন এই অপরাধের জন্য তোমার কী শাস্তি হবে সেটা তুমি জান নিশ্চয়ই ?'

এবার সামারভিল মুখ খুলল। তারও কণ্ঠস্বর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

'ডক্টর গ্রোপিয়াস, আপনি যখন বক্তৃতার দিন মঞ্চ থেকে শঙ্কুকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তার চোখ থেকে চশমাটি খুলে পড়ে যায়। ঘোলাটে কাঁচ, কতকটা সানগ্লাসের মতো। সেই চশমাটি ফিংকেলস্টাইন তুলে নেয়। চশমার ডান্ডায় একটি চুল আটকে ছিল। চুলটা নাইলনের। আজ ফিংকেলস্টাইনের চাকরের কথায় মনে হল শঙ্কুরই মতো দেখতে আরেকজন লোক আমাদের আধ ঘণ্টা আগে ফিংকেলস্টাইনের সঙ্গে দেখা করতে যায়। আমরা সিঁড়িতে তার জুতোর ছাপ দেখেছি। বাড়ির বাইরে এবং রাস্তাতেও দেখেছি। এই লোকটি যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই খুনটা হয়। আততায়ী দস্তানা পরেনি। তার আঙুলের স্পষ্ট ছাপ ফিংকেলস্টাইনের গলায় ছিল। এই জাল-শঙ্কু যে-খুনটা করেছে, সেটা আপনি আসল শঙ্কুর ঘাড়ে চাপাবেন কী করে ?'

গ্রোপিয়াস হঠাৎ হো হো করে এক অস্বাভাবিক হিংস্র তেজে হেসে উঠল।

'কী করে চাপাবো সেটা দেখতেই পাবে ! কাল শঙ্কু আমার বাড়িতে বসে আমার পেয়ালা থেকে হট চকোলেট খেয়েছে, আমার ফোটো অ্যালবামের পাতা উলটে দেখেছে—এসবে কি আর তার আঙুলের ছাপ পড়েনি ? আজকাল কৃত্রিম আঙুলের ছাপ তৈরি করা যায়। প্রোফেসর সামারভিল !—হান্‌স গ্রোপিয়াসের আবিষ্কার এটা ! ইতিমধ্যে ইউরোপের তিনজন সেরা ক্রিমিন্যালকে আমি এর উপায় বাতলে দিয়েছি !'

এতক্ষণ লক্ষ করিনি যে দরজার বাইরে গ্রোপিয়াসের আড়ালে আরেকটি লোক দাঁড়িয়ে আছে পকেটে হাত দিয়ে। একে আমি চিনি। এই লোকই সেদিন পাশের ঘর থেকে আড়ি পেতেছিল।

'অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে তোমার এই পরিণাম হতে চলেছে,' গ্রোপিয়াস আমার দিকে চেয়ে বলল। 'এই অবস্থায় পড়ে মাথা যদি সত্যিই খারাপ হয়, তাহলে অবিশ্যি ওয়েবারের ক্লিনিক রয়েছে ; সেখানে আমারই আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে ব্রেনসাপ্লান্টের কাজ শুরু হয়েছে। এবারে বোধহয় আর আমাকে টেক্কা দিতে পারবে না ! গুড ডে, শঙ্কু ! গুড ডে, প্রোফেসর সামারভিল !'

গ্রোপিয়াস আর তার অনুচর সিঁড়িতে ভারী শব্দ তুলে নিচে নেমে গেল। আমি খাটে বসে পড়লাম। সামারভিল পায়চারি শুরু করেছে। দুবার তাকে বলতে

শুনলাম—'কী শয়তান ! কী শয়তান !'

আমি বুঝতে পারছি চারদিক থেকে জাল ঘিরে আসছে আমাকে । আঙুলের ছাপও যদি মিলে যায় তাহলে আর বেরোবার কোনো পথ নেই । যদি না—

যদি না জাল-শঙ্কুকে খুঁজে বার করে পুলিশের সামনে উপস্থিত করা যায় ।

'ফাঁদে যখন পড়েছি,' পায়চারি থামিয়ে বলল সামারভিল, 'তখন ফাঁদের শেষ দেখে যেতে হবে । মরতে হলে লড়ে মরা ভালো, এভাবে নয় ।'

বুঝলাম আমার বিপদকে নিজের ঘাড়ে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছে না সামারভিল ।

চাবি দিয়ে সুটকেস খুলে রিভলভার বার করে সে পকেটে পুরল । বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে শিকারেও যে তার আশ্চর্য দখল সেটা সে ভিনিজুয়েলার জঙ্গলে অনেকবার প্রমাণ করেছে । আমিও আমার 'অ্যানাইহিলিন গান' বা নিশ্চিহ্নাস্ত্রটা সঙ্গে নিলাম । মাত্র চার ইঞ্চি লম্বা আমার এই আশ্চর্য অস্ত্রটি আমি পারতপক্ষে ব্যবহার করি না ।

ঘরের দরজা বন্ধ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমরা হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এলাম । একটা ট্যাক্সি দেখে সেটাকে হাত তুলে থামিয়ে এগিয়ে যেতে ড্রাইভার আমাকে দেখেই 'নাইন, নাইন' অর্থাৎ না না বলে মাথা নাড়ল । সেটাই আবার 'ইয়া ইয়া' হয়ে গেল যখন সামারভিল তার হাতে একটা একশো গ্রোশেনের নোট গুঁজে দিল ।

একটুক্ষণ আগেই একটা সাইরেনের শব্দ পেয়েছি ; আমাদের ট্যাক্সিটা যখন রওনা হয়েছে তখন দেখলাম একটা পুলিশের গাড়ি আমাদের হোটেলের দিকে যেতে যেতে আমাদের গাড়িটা দেখেই ব্রেক কষল ।

সামারভিল এবার একটা দুশো গ্রোশেনের নোট ড্রাইভারের হাতে দিয়ে বলল, 'খুব জোরে চালাও—গ্রুনেওয়াল্ডস্ট্রাসে যাব ।'

সকালে রোদ বেরিয়েছিল, কিন্তু এখন দেখছি পশ্চিম দিক থেকে কালো মেঘ এসে আকাশটাকে ছেয়ে ফেলেছে । তার ফলে তাপমাত্রাও নেমে গেছে অন্তত বিশ ডিগ্রী ফারেনহাইট । আমাদের মার্সেডিস ট্যাক্সি ঝড়ের মতো এগিয়ে চলল ট্র্যাফিক বাঁচিয়ে ।

মিনিট দশেক চলার পর পিছনে দূর থেকে আবার সাইরেনের শব্দ পেলাম । সামারভিল ড্রাইভারের পিঠে হাত দিয়ে একটা মৃদু চাপ দিল । ফলে আমাদের গাড়ির গতি আরো বেড়ে গেল । স্পীডোমিটারের কাঁটা প্রায় একশো কিলোমিটারের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে । চালকের অশেষ বাহাদুরি যে আমাদের অ্যাক্সিডেন্টের হাত থেকে বাঁচিয়ে সে বিশ মিনিটের মধ্যে এনে ফেলল গ্রুনেওয়াল্ডস্ট্রাসে-তে ।

সামনে একটা মিছিল, তাই বাধ্য হয়ে গাড়ির গতি কমাতে হল । দশ-বারোজন লোক একটা কফিন নিয়ে বাঁয়ে গোরস্থানের গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে গেল । তার মধ্যে দুজনকে চিনলাম—কাল যে চাকরটি হট চকোলেট এনে দিয়েছিল এবং গ্রোপিয়াস নিজে ।

আমাদের গাড়ি গোরস্থানের গেট ছাড়িয়ে গ্রোপিয়াসের গেটে পৌঁছানোর ঠিক আগে সামারভিল চেঁচিয়ে উঠল—

'স্টপ দ্য কার !—গাড়ি ব্যাক্ কর ।'

বকশিস পাওয়া ড্রাইভার তৎক্ষণাৎ গাড়ি থামিয়ে ব্যাক্ করে গোরস্থানের গেটের সামনে এসে থামল । আমরাও নামলাম, আর সেই সঙ্গে সাইরেনের শব্দে গোরস্থানের স্তব্ধতা চিরে পুলিশের গাড়ি এসে আমাদের ট্যাক্সির পিছনে সশব্দে ব্রেক কষল ।

গোরস্থানে একটা সদ্য-খোঁড়া গর্তের পাশে রাখা হয়েছে কফিনটাকে । শবযাত্রীদের সকলেই আমাদের দিকে দেখছে—এমনকি গ্রোপিয়াসও ।

পুলিশের গাড়ি থেকে একজন ইন্স্পেক্টর ও আরো দুটি লোকের সঙ্গে নামলো ফিংকেলস্টাইনের ভৃত্য আনটন, এবং নেমেই আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, 'ওই সেই লোক ।'

পুলিশ অফিসার আমার দিকে এগিয়ে এলেন ।

গোরস্থানে পাদ্রী তার শেষকৃত্য শুরু করে দিয়েছে ।

'প্রোফেসর শঙ্কু ! আমার নাম ইন্স্পেক্টর ডীট্রিখ । আপনাকে আমাদের সঙ্গে একটু—'

দুম্—দুম্—দুম্ !

সামারভিলের রিভলভার তিনবার গর্জিয়ে উঠেছে । সঙ্গে সঙ্গে তিনবার কাঠ ফাটার শব্দ ।

'ওকে পালাতে দিও না !'—সামারভিল চিৎকার করে উঠল—কারণ গ্রোপিয়াস গোরস্থানের পিছন দিক লক্ষ্য করে ছুট দিয়েছে । একজন পুলিশের লোক হাতে রিভলভার নিয়ে তার দিকে তীরবেগে ধাওয়া করে গেল । ইন্স্পেক্টর ডীট্রিখ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'যে পালাবে তাকেই গুলি করা হবে ।'

এদিকে আমার বিস্ফারিত দৃষ্টি চলে গেছে কফিনের দিকে । তিনটের একটা গুলি তার পাশের দেয়াল ভেদ করে ভিতরে ঢুকে গেছে । অন্য দুটো ঢাকনার কানায় লেগে সেটাকে দ্বিখণ্ডিত করে স্থানচ্যুত করেছে ।

কফিনের ভিতর বিশাল দুটি নিষ্পলক পাথরের চোখ নিয়ে যিনি শুয়ে আছেন তিনি হলেন আমারই ডুপ্লিকেট—শঙ্কু নাম্বার টু ।

এবারে সমবেত সকলের রক্ত হিম করে, ডীট্রিখের হাত থেকে রিভলভার

খসিয়ে দিয়ে, পুলিশের বগলদাবা গ্রোপিয়াসকে অজ্ঞান করে দিয়ে, কফিনবদ্ধ দ্বিতীয় শঙ্কু ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। বুঝলাম তাঁর পাঁজরা দিয়ে গুলি প্রবেশ করে তাঁর দেহের ভিতরের যন্ত্র বিকল করে দিয়েছে ; কারণ ওই বসা অবস্থাতেই গ্রোপিয়াস-সৃষ্ট জাল শঙ্কু তাঁর শরীরের ভিতরে রেকর্ড করা একটি পুরানো বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন—

‘ভদ্রমহোদয়গণ !—আজ আমি যে কথাগুলো বলতে এই সভায় উপস্থিত হয়েছি, সেগুলো আপনাদের মনঃপূত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না, কিন্তু—’

আমি আমার অ্যানাইহিলিন বন্দুকটি পকেট থেকে বার করলাম। আমার এই পৈশাচিক জোড়াটিকে পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারলে তবেই আমার মুক্তি।

নকুড়বাবু ও এল ডোরাডো

১৩ই জুন

আজ সকালের ঘটনাটা আমার কাজের রুটিন একেবারে তছনছ করে দিল। কাজটা অবিশ্যি আর কিছুই না ; আমার যাবতীয় আবিষ্কার বা ইনভেনশনগুলো সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখছিলাম সুইডেনের বিখ্যাত কসমস পত্রিকার জন্য। এ-কাজটা এর আগে কখনো করিনি, যদিও নানান দেশের নানান পত্রিকা থেকে অনুরোধ এসেছে অনেকবার। সময়ের অভাবে প্রতিবারই প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। ইদানীং আমার গবেষণার কাজ ইচ্ছে করেই অনেক কমিয়ে দিয়েছি। এটা ক্রমেই বুঝতে পারছি যে, গিরিডির মতো জায়গায় বসে আমার গবেষণাগারের সামান্য উপকরণ নিয়ে আজকের যুগে শুধু যে আর বিশেষ কিছু করা যায় না তা নয়, করার প্রয়োজনও নেই। দেশে-বিদেশে বহু তরুণ বৈজ্ঞানিক আশ্চর্য সব আধুনিক যন্ত্রপাতি হাতে পেয়ে, এবং সেই সঙ্গে নানান বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় যে-সব কাজ করছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। অবিশ্যি আমি নিজে সামান্য ব্যয়ে সামান্য মালমশলা নিয়ে যা করেছি তার স্বীকৃতি দিতে বৈজ্ঞানিক মহল কার্পণ্য করেনি। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেই আবার এমন লোকও আছে, যারা আমাকে বৈজ্ঞানিক বলে মানতেই চায়নি। তাদের ধারণা, আমি একজন জাদুকর বা প্রেতসিদ্ধ গোছের কিছু ; বৈজ্ঞানিকের চোখে ধুলো দেবার নানারকম মন্ত্রতন্ত্র আমার জানা আছে, আর তার জোরেই আমার প্রতিষ্ঠা। আমি অবশ্য এটা নিয়ে কোনোদিনই নিজেকে উত্তেজিত হতে দিইনি। আমার মধ্যে যে একটা ঋষিসুলভ স্থৈর্য ও সংযম আছে সেটা আমি জানি। এককথায় আমি মাথা-ঠাণ্ডা মানুষ। পশ্চিমে এমন অনেক জ্ঞানী-গুণী গবেষকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, যাঁরা কথায়-কথায় টেবিল চাপড়ান, বা টেবিলের অভাবে নিজেদের হাঁটু। জার্মানির এক জীবরাসায়নিক ডঃ

হেলব্রোনার একবার তাঁর এক নতুন আবিষ্কারের কথা বলতে গিয়ে উত্তেজিত হয়ে আমার কাঁধে এমন এক চপেটাঘাত করেছিলেন যে, যন্ত্রণায় আমাকে আর্তনাদ করে উঠতে হয়েছিল।

যাই হোক, এই প্রবন্ধে একটা জিনিস বুঝিয়ে বলার সুযোগ পাচ্ছি ; সেটা হল—আমার আবিষ্কারগুলো কেন আমি সারা পৃথিবীর ব্যবহারার্থে ছড়িয়ে দিইনি। তার কারণ আর কিছুই না—আমার তৈরি জিনিসগুলোর মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী বা হিতসাধক—যেমন অ্যানাইহিলিন পিস্তল বা মিরাকিউরল ওষুধ বা অমনিস্কোপ বা মাইক্রোসোনোগ্রাফ, বা স্মৃতি-উদ্ঘাটক যন্ত্র রিমেমব্রেন—এর কোনোটাই কারখানায় তৈরি করা যায় না। এগুলো সবই মানুষের হাতের কাজ এবং সে-মানুষও একটি বৈ আর দ্বিতীয় নেই। তিনি হলেন ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু।

আজ ভোরে যথারীতি উশ্রীর ধারে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে কফি খেয়ে আমার লেখাপড়ার ঘরে বসে আমার পঞ্চাশ-বছর-ব্যবহার-করা ওয়াটারম্যান ফাউনটেন পেনটাতে কালি ভরে লেখা শুরু করতে যাব, এমন সময় আমার চাকর প্রহ্লাদ এসে বলল একটি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

"কোন্ দেশীয় ?" প্রশ্ন করলাম আমি। স্বাভাবিক প্রশ্ন, কারণ পৃথিবীর খুব কম দেশই আছে, যেখানকার গুণী-জ্ঞানীর কেউ-না-কেউ কোনোদিন-না-কোনোদিন এই গিরিডিতে আমার বাড়িতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেননি। তিন সপ্তাহ আগে লিথুয়ানিয়া থেকে এসেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত পতঙ্গ-বিজ্ঞানী প্রোফেসর জাবলনস্কিস।

"তা তো জিগ্যেস করিনি," বলল প্রহ্লাদ, "তবে ধুতি দেখলাম, আর খদ্দরের পাঞ্জাবি, আর কথা তো বললেন বাংলাতেই।"

"কী বললেন ?" কথাটা অপ্রীতিকর শোনালেও স্বীকার করতেই হবে যে, মামুলি লোকের সঙ্গে মামুলি খেজুরে আলাপের সময় নেই আমার।

"বললেন কী, তোমার বাবুকে বলো কিসমিসের জন্য লেখাটা একটু বন্ধ করে যদি দশ মিনিট সময় দেন। কী যেন বলার আছে।"

কিসমিস ? তার মানে কি কসমস ? কিন্তু তা কী করে হয় ? আমি যে কসমস পত্রিকার জন্য লিখছি, সে-কথা তো এখানে কেউ জানে না !

উঠে পড়লাম লেখা ছেড়ে। কিসমিস-রহস্য ভেদ না করে শান্তি নেই।

বসবার ঘরে ঢুকে যাঁকে দু' হাতের মুঠোয় ধুতির কোঁচা ধরে সোফার এক পাশে জবুথবু হয়ে বসে থাকতে দেখলাম, তেমন নিরীহ মানুষ আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। যদিও প্রথম চাহনির পর দ্বিতীয়তে লক্ষ করা যায় এঁর চোখের মণির বিশেষত্বটা : এঁর মধ্যে যেটুকু প্রাণশক্তি আছে, তার সবটুকুই যেন ওই

মণিতে গিয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

"নমস্কার তিলুবাবু !" কোঁচার ডগা সমেত হাত দুটো মুঠো অবস্থায় চলে এল ভদ্রলোকের থুতনির কাছে।—"কসমসের লেখাটা বন্ধ করলাম বলে মার্জনা চাইছি। আপনার সঙ্গে সামান্য কয়েকটা কথা বলার প্রবল বাসনা নিয়ে এসেছি আমি। আমি জানি আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।"

শুধু কসমস নয়, তিলু-নামটা ব্যবহার করাটাও একটা প্রচণ্ড বিস্ময়-উদ্রেককারী ব্যাপার। ষাট বছর আগে আমার বাবা শেষ আমায় ডেকেছেন ওই নামে। তার পরে ডাকনামটার আর কোনো প্রয়োজন হয়নি।

"অধমের নাম শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস।"

আমার বিস্ময় কাটেনি, তাই ভদ্রলোকই কথা বলে চলেছেন।

"মাকড়দায় থাকি ; ক'দিন থেকেই আপনাকে দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। অবিশ্যি সে-দেখা আর এ-দেখা এক জিনিস নয়।"

"আমাকে দেখতে পাচ্ছেন মানে ?" আমি প্রশ্ন করতে বাধ্য হলাম।

"এটা মাস দেড়েক হল আরম্ভ হয়েছে। অন্য জায়গার লোক, অন্য জায়গার ঘটনা, এইসব হঠাৎ চোখের সামনে দেখি। সব সময় খুব স্পষ্ট নয়, তাও দেখি। আপনার নাম শুনেছি, ছবিও দেখেছি কাগজে। সেদিন আপনার চেহারাটা মনে করতেই দেখি আপনি এসে হাজির।"

"এ জিনিস দেড় মাস থেকে হচ্ছে আপনার ?"

"হ্যাঁ। তা দেড় মাসই হবে। খুব জল হচ্ছিল সেদিন, আর তার সঙ্গে মেঘের ডাক। দুপুরবেলা। দাওয়ায় বসে গোলা তেঁতুলের আচার খাচ্ছি, হঠাৎ দেখি সামনে বিশ হাত দূরে মিত্তিরদের বাড়ির ভেরেণ্ডা গাছের পিছন দিকে একটা আগুনের গোলার মতো কী যেন শূন্যে ঘোরাফেরা করছে। বললে বিশ্বাস করবেন না, তিলুবাবু, গোলাটা এল ঠিক আমারই দিকে। যেন একটি জ্যোতির্ময় ফুটবল। উঠোনে তুলসীর কাছ অবধি আসতে দেখেছি এটা মনে আছে, তারপর আর মনে নেই। জ্ঞান যখন হল তখন জল থেমে গেছে। আমি ছিলাম তক্তপোশে ; তিনটে বেড়ালছানা খেলা করছিল উঠোনে, দাওয়ার ঠিক সামনেই। সে-তিনটে মরে গেছে। অথচ আমার গায়ে আঁচড়টি নেই। আমাদের বাড়ির পিছনে একটা মাদার গাছ আর একটা কতবেল গাছ ছিল, দুটোই পুড়ে ঝামা।"

"আর বাড়ির অন্য লোক ?"

"ঠাকুমা ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। ছোট ভাই ছিল ইস্কুলে ; সে মাকড়দা প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টার। মা নেই ; বাবা ছিলেন ননী ঘোষের বাড়ি, দাবার আড্ডায়। ঠাকুমার অসুখ। খাটে শুয়ে ছিলেন পিছন দিকের ঘরে, তাঁর কিচ্ছু হয়নি।"

বর্ণনা শুনে মনে হল 'বল লাইটনিং'-এর কথা বলছেন ভদ্রলোক। ক্বচিৎ কদাচিৎ এ ধরনের বিদ্যুতের কথা শোনা যায়, যেটা ঠিক বলেরই আকার ধরে কিছুক্ষণ শূন্য দিয়ে ভেসে বেড়িয়ে হঠাৎ এক্সপ্লোড করে। সে-বিদ্যুৎ একটা মানুষের কাছ দিয়ে যাবার ফলে যদি দেখা যায় যে সে-মানুষের মধ্যে একটা বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে গেছে, তাহলে বলার কিছু নেই। কাছাকাছি বাজ পড়ে কালা কানে শুনেছে, অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে, এমন খবরও কাগজে পড়েছি। প্রশ্ন হচ্ছে, এই ভদ্রলোকের শক্তির দৌড় কতদূর।

প্রশ্নটা করার আগেই উত্তরের খানিকটা আভাস পেয়ে গেলাম।

নকুড়বাবু হঠাৎ বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "থ্রি এইট এইট এইট নাইন ওয়ান সেভেন ওয়ান।" দেখলাম তিনি চেয়ে রয়েছেন সামনে টেবিলের উপর রাখা আমেরিকান সাপ্তাহিক 'টাইম'-এর মলাটের দিকে। মলাটে যাঁর ছবি রয়েছে তিনি হলেন মার্কিন ক্রোড়পতি পেট্রস সারকিসিয়ান। ছবির দিকে চেয়েই নকুড়বাবু বলে চলেছেন, "সাহেবের ঘরে একটা সিন্দুক দেখতে পাচ্ছি—খাটের ডান পাশে—ক্রক্সলি কোম্পানির তৈরি—ভিতরে টাকা—বাণ্ডিল-বাণ্ডিল একশো ডলারের নোট..."

"আর আপনি যে-নম্বরটা বললেন, সেটা কী ?"

"ওটা সিন্দুকটা খোলার নম্বর। ডালার গায়ে একটা দাঁত-কাটা চাকার মতো জিনিস, আর সেটাকে ঘিরে খোদাই করা এক থেকে নয় অবধি নম্বর। চাকাটা এদিকে-ওদিকে ঘোরে। নম্বর মিলিয়ে ঘোরালেই খুলে যাবে সিন্দুক।"

কথাটা বলে হঠাৎ একটা ভীষণ কুণ্ঠার ভাব করে ভদ্রলোক বললেন, "অপরাধ নেবেন না তিলুবাবু। এসব কথা আপনার মতো ব্যস্ত মানুষের কাছে বলতে আসা মানেই আপনার মূল্যবান সময়—"

"মোটেই না," আমি বাধা দিয়ে বললাম। "আপনার মতো ক্ষমতা একটা দুর্লভ ব্যাপার। আপনার সাক্ষাৎ পাওয়াটা একজন বৈজ্ঞানিকের পক্ষে খুবই সৌভাগ্যের কথা। আমি শুধু জানতে চাই—"

"আমি বলছি আপনাকে। আপনি জানতে চাইছেন 'বল লাইটনিং'-এর সংস্পর্শে এসে আমার মধ্যে আর কী কী বিশেষ ক্ষমতা দেখা দিয়েছে, এই তো ?"

নির্ভুল অনুমান। বললাম, "ঠিক তাই।"

নকুড়বাবু বললেন, "মুশকিল হচ্ছে কী জানেন ? এগুলোকে তো আর বিশেষ ক্ষমতা বলে ভাবতে পারি না আমি ! মানুষ যে হাসে বা কাঁদে বা হাই তোলে বা নাক ডাকায়—এগুলোকে কি আর মানুষ বিশেষ ক্ষমতা বলে মনে করে ? এ তো নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবিক। আমিও যা করছি সেগুলো বিশেষ ক্ষমতা ভেবে করছি না। যেমন ধরুন আপনার ওই টেবিলটা। ওটার ওপর কী রয়েছে

বলুন তো ?"

আমি ভদ্রলোকের ইঙ্গিত অনুসরণ করে আমার ঘরের কোণে রাখা কাশ্মীরী টেবিলটার দিকে দেখলাম।

টেবিলের উপর একটা জিনিস রয়েছে যেটা এর আগে কোনোদিন দেখিনি। সেটা একটা পিতলের মূর্তি—যদিও খুব স্পষ্ট নয়। যেন একটা স্পন্দনের ভাব, একটা স্বচ্ছতা রয়েছে মূর্তিটার মধ্যে। দেখতে-দেখতেই মূর্তিটা মিলিয়ে গেল।

"কী দেখলেন ?"

"একটা পিতলের ধ্যানী-বুদ্ধমূর্তি। তবে ঠিক নিরেট নয়।"

"ওইতোবললুম। এখনো ঠিক রপ্ত হয়নি ব্যাপারটা। মূর্তিটা রয়েছে আমাদের উকিল শিবরতন মল্লিকের বাড়ির বৈঠকখানায়। একবার দেখেছিলুম। এখনকার মতো আপনার ওই টেবিলে আছে বলে কল্পনা করলুম, কিন্তু পুরোপুরি এল না।"

আমি মনে-মনে বলছিলাম, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো জাদুকর (একমাত্র চীনে জাদুকর চী চিং ছাড়া) আমাকে হিপনোটাইজ করতে পারেনি। ইনি কিন্তু অনেকটা সমর্থ হয়েছেন। এও একরকম সম্মোহন বই কী ! নকুড় বিশ্বাসের একাধিক ক্ষমতার মধ্যে এটাও একটা। হিপনোটিজম, টেলিপ্যাথি, ক্লেয়ারভয়েন্স বা অলোকদৃষ্টি—এ সব ক'টা ক্ষমতাই দেখছি একসঙ্গে পেয়ে গেছেন ভদ্রলোক।

"শিবরতনবাবুর কাছেই আপনার কথা প্রথম শুনি," বললেন নকুড়বাবু। "তাই ভাবলুম একবার গিরিডিটা হয়ে আসি। আপনার দর্শনটাও হয়ে যাবে, আর সেই সঙ্গে একটা ব্যাপারে আপনাকে একটু সাবধানও করে দিতে পারব।"

"সাবধান ?"

"আজ্ঞে কিছু মনে করবেন না, তিলুবাবু, ধৃষ্টতা মাপ করবেন ; আমি জানি আপনি তো শুধু আমাদের দেশের লোক নন ; সারা বিশ্বে আপনার সম্মান, পৃথিবীর সব জায়গা থেকেই আপনার ডাক পড়ে, আর আপনাকে সে সব ডাকে সাড়াও দিতে হয়। কিন্তু সাও পাউলোর ব্যাপারটাতে গেলে আপনাকে বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকতে অনুরোধ করি।"

সাও পাউলো হল ব্রেজিলের সব চেয়ে বড় শহর। সেখান থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো ডাক আসেনি আমার। বললাম, "সাও পাউলোতে কী ব্যাপার ?"

"আজ্ঞে সেটা এখনো ঠিক বলতে পারলাম না। ব্যাপারটা এখনো ঠিক স্পষ্ট নয় আমার কাছে। সত্যি বলতে কী, সাও পাউলো যে কোথায় তাও আমি জানি না। হঠাৎ চোখের সামনে দেখতে পেলুম একটা লম্বা সাদা খাম, তার উপর টাইপ করা আপনার নাম ও ঠিকানা, খামের এক কোণে একটা নতুন ডাকটিকিট, তার উপর একটা ছাপ পড়ল—'সাও পাউলো'—আর সঙ্গে-সঙ্গে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। আর তার পর মুহূর্তেই দেখলুম একটা সুদৃশ্য কামরা, তাতে এক

বিশালবপু বিদেশী ভদ্রলোক আপনার দিকে চেয়ে বসে আছেন। লোকটিকে দেখে মোটেই ভাল লাগল না।"

দশ মিনিট হয়ে গেছে দেখেই বোধহয় ভদ্রলোক উঠে পড়ছিলেন, আমি বসতে বললাম। অন্তত এক কাপ কফি না খাইয়ে ছাড়া যায় না ভদ্রলোককে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে এঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার কী উপায় সেটাও জানা দরকার।

ভদ্রলোক রীতিমতো সঙ্কোচের সঙ্গে আধা-ওঠা অবস্থা থেকে বসে পড়লেন। বললাম, "আপনি উঠেছেন কোথায়?"

"আজ্ঞে, উঠেছি মনোরমা হোটেলে।"

"থাকবেন ক'দিন?"

"যে কাজের জন্য আসা সে কাজ তো হয়ে গেল, কাজেই..."

"কিন্তু আপনার ঠিকানাটা যে জানা দরকার।"

লজ্জায় ভদ্রলোকের ঘাড় বেঁকে গেল। সেই অবস্থাতেই বললেন, "আমার ঠিকানা আপনি চাইছেন এ তো বিশ্বাসই করতে পারছি না।"

এবার ভদ্রলোককে একটু কড়া করেই বলতে হল যে তাঁর বিনয়টা একটু আদিখ্যেতার মতো হয়ে যাচ্ছে। বললাম, "আপনি জেনে রাখুন যে, আপনার সঙ্গে মাত্র দশ মিনিটের পরিচয়ের পর একেবারে যোগবিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াটা যে-কোনো বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই একটা আপসোসের কারণ হতে পারে।"

"আপনি কেয়ার অফ হরগোপাল বিশ্বাস, মাকড়দা দিলেই আমি চিঠি পেয়ে যাব। আমার বাবাকে ওখানে সবাই চেনে।"

"আপনি বিদেশ যাবার সুযোগ পেলে যাবেন?"

প্রশ্নটা কিছুক্ষণ থেকেই মাথায় ঘুরছিল। সেটার কারণ আর কিছুই না—অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা বা ঘটনা সম্পর্কে পশ্চিমে অনেক বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটা হেসে উড়িয়ে দেবার ভাব লক্ষ করেছি। শ্রীমান নকুড় বিশ্বাসকে একবার তাদের সামনে নিয়ে ফেলতে পারলে মন্দ হত না। আমি নিজে অবিশ্যি এই সন্দেহবাদীদের দলে নই। নকুড়বাবুর এই ক্ষমতা আমি মোটেই অবজ্ঞা বা অবিশ্বাসের চোখে দেখি না। মানুষের মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আমরা এখনো স্পষ্টভাবে কিছুই জানি না। আমার ঠাকুরদা বটুকেশ্বর ছিলেন শ্রুতিধর। একবার শুনলে বা পড়লেই একটা গোটা কাব্য তাঁর মুখস্থ হয়ে যেত। অথচ তিনি পুরোদস্তুর সংসারী লোক ছিলেন; এমন না যে দিন-রাত কেবল পড়াশুনা বা ধর্মকর্ম নিয়ে থাকতেন। এটা কী করে সম্ভব হয় সেটা কি পশ্চিমের কোনো বৈজ্ঞানিক সঠিক বলতে পারে? পারে না, কারণ তারা এখনো মস্তিষ্কের অর্ধেক রহস্যই উদ্ঘাটন করতে পারেনি।

কিন্তু আমার প্রশ্ন শুনে নকুড়বাবু এমন ভাব করলেন যেন আমি উন্মাদের

মতো কিছু বলে ফেলেছি।

"আমি বিদেশ যাব?" চোখ কপালে তুলে বললেন নকুড়বাবু। "কী বলছেন আপনি তিলুবাবু? আর যদি বা ইচ্ছেই থাকত, আমার মতো লোকের পক্ষে সেটা সম্ভবই বা হত কী করে?"

আমি বললাম, "বাইরের অনেক বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানই কোনো বিজ্ঞানী-সম্মেলনে কাউকে আমন্ত্রণ জানালে তাঁকে দুটো প্লেনের টিকিট দিয়ে থাকেন, এবং সেখানে দুজনের থাকার খরচ বহন করে থাকেন। কেউ-কেউ নিয়ে যান স্ত্রীকে, কেউ বা সেক্রেটারিকে। আমি অবশ্য একাই গিয়ে থাকি, কিন্তু আপনি যেতে সম্মত হলে—"

নকুড়বাবু একসঙ্গে মাথা নেড়ে, জিভ কেটে আমার প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি জানিয়ে উঠে পড়লেন।

"আপনি যে আমার কথাটা ভেবেছেন সেইটেই আমার অনেক পাওয়া। এর বেশি আর আমি কিছু চাই না।"

আমি কিছুটা ঠাট্টার সুরে বললাম, "যাই হোক, যদি আপনার দিব্যদৃষ্টিতে কোনোদিন আপনার বিদেশ যাবার সম্ভাবনা দেখতে পান, তাহলে আমাকে জানাবেন।"

নকুড়বাবু যেন আমার রসিকতাটা উপভোগ করেই মৃদু হেসে দু'হাতে কোঁচার গোছটা তুলে নিয়ে নমস্কার করে বললেন, "আমার প্রণাম রইল। নিউটনকে আমার আশীর্বাদ দেবেন।"

২১শে জুন

কসমস পত্রিকার জন্য প্রবন্ধটা কাল পাঠিয়ে দিলাম।

শ্রীমান নকুড়চন্দ্রের আর কোনো খবর পাইনি। সে নিজে না-দিলে আর কে দেবে খবর। আমার দিক থেকে খুব বেশি আগ্রহ দেখানোটাও ঠিক নয়, তাই ঠিকানা জানা সত্ত্বেও আমি তাকে চিঠি লিখিনি। অবিশ্যি ইতিমধ্যে আমার দুই বন্ধু সন্ডার্স ও ক্রোলকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছি। তারা দু'জনেই গভীর কৌতূহল প্রকাশ করেছে। ক্রোল বলছে, নকুড় বিশ্বাসকে ইউরোপে নিয়ে গিয়ে ডেমনস্ট্রেশনের জন্য খরচ সংগ্রহ করতে কোনো অসুবিধা হবে না। এমনকি, টেলিভিশন প্রোগ্রাম ইত্যাদির জোরে নকুড় বিশ্বাস বেশ কিছু টাকা হাতে নিয়ে দেশে ফিরতে পারবে। আমি জানিয়ে দিয়েছি, মাকড়দাবাসীর কাছ থেকে উৎসাহের কোনো ইঙ্গিত পেলেই জানাব।

২৪শে জুলাই

গত এক মাসে আমার প্রবন্ধটা সম্পর্কে একশো সাতাত্তরটা চিঠি পেয়েছি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের কাছ থেকে। সবই অভিনন্দনসূচক। তার মধ্যে একটি চিঠি হল এক বিরাট মার্কিন কেমিক্যাল কর্পোরেশনের মালিক সলোমন ব্লুমগার্টেনের কাছ থেকে। তিনি জানিয়েছেন যে, আমার অন্তত তিনটি আবিষ্কারের পেটেন্ট স্বত্ব তিনি কিনতে রাজী আছেন। তার জন্য তিনি আমাকে পঁচাত্তর হাজার ডলার দিতে প্রস্তুত। আবিষ্কার তিনটি হল অ্যানাইহিলিন পিস্তল, মিরাকিউরল বড়ি ও অমনিস্কোপ যন্ত্র। যদিও আমি প্রবন্ধে লিখেছিলাম যে, এসব জিনিস কারখানায় তৈরি করা যায় না, সে-কথাটা ব্লুমগার্টেন মানতে রাজী নন। তাঁর ধারণা, একজন মানুষ নিজে হাতে যেটা তৈরি করতে পারে, যন্ত্রের সাহায্যে সেটা তৈরি না-করতে পারার কোনো যুক্তি থাকতে পারে না। এসব ব্যাপারে চিঠি মারফত তর্ক করা বৃথা ; তাই আমি জানিয়ে দিয়েছি যে, ব্যক্তিগত কারণে আমি পেটেন্ট রাইটস বিক্রি করতে রাজী নই।

পঁচাত্তর হাজার ডলারেও আমার লোভ লাগল না দেখে সাহেবের না জানি কী প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

১৭ই আগস্ট

আজ এক অপ্রত্যাশিত চিঠি। লিখছেন শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। চিঠির ভাব ও ভাষা দুইই অপ্রত্যাশিত। তাই সেটা তুলে দিচ্ছি—

শ্রীত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু মহাশয়ের শ্রীচরণে শত কোটি প্রণামপূর্বক নিবেদনমিদং—

মহাশয়,

অধমকে যে আপনি স্মরণে রাখিয়াছেন সে-বিষয়ে অবগত আছি। অবিলম্বে সাও পাউলো হইতে আমন্ত্রণ আপনার হস্তগত হইবে। আপনি সঙ্গত কারণেই উক্ত আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না। আপনার স্মরণে থাকিবে যে, আপনি আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন আপনার দাসানুদাস সেক্রেটারিরূপে আপনার সহিত বিদেশ গমনের জন্য। তৎকালে সম্মত হই নাই, কিন্তু স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর ক্রমে উপলব্ধি করিয়াছি যে, সাও পাউলোতে আপনার পার্শ্বে উপস্থিত না থাকিলে আপনার সমূহ বিপদ। আমি গত কয়েক মাস অক্লান্ত পরিশ্রমে পিটম্যান পদ্ধতিতে শর্টহ্যান্ড বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি। উপরন্তু এটিকেট সম্পর্কে কতিপয় পুস্তক পাঠ করিয়া পাশ্চাত্য আদবকায়দা কিছুটা আয়ত্ত করিয়াছি। অতএব আপনি আমাকে আপনার অনুচর রূপে সঙ্গে লইবার ব্যাপারে কী স্থির করেন তাহা

পত্রপাঠ জানাইলে বাধিত হইব। আপনি ভারতের তথা বিশ্বের গৌরব। সর্বোপরি আপনি বঙ্গসন্তান। আপনার দীর্ঘ, রোগমুক্ত, নিঃসঙ্কট জীবন আমাদের সকলেরই কাম্য। ইতি।

সেবক শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস

এখানে প্রশ্ন হচ্ছে—আমার সঙ্গে বাইরে যাবার ব্যাপারে হঠাৎ মত পরিবর্তনের কারণ যেটা বলছেন নকুড়বাবু, সেটা কি সত্যি ? নাকি এর মধ্যে কোনো গূঢ় অভিসন্ধি আছে ? ভদ্রলোক কি আসলে গভীর জলের মাছ ? চিঠির ভাব ও ভাষা কি আসলে আদিখ্যেতা ?

লোকটার মধ্যে সত্যিই কতকগুলো আশ্চর্য ক্ষমতা আছে বলে এই প্রশ্নগুলো আসছে। অবিশ্যি এখন এ-বিষয়ে ভেবে লাভ নেই। আগে নেমন্তন্নটা আসে কিনা দেখা যাক, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

৩রা সেপ্টেম্বর

নকুড়বাবু আবার অবাক করলেন। আমন্ত্রণ এসে গেছে। আরো অবাক হয়েছি এই কারণে যে, এ-আমন্ত্রণ সত্যিই ঠেলা যাবে না। সাও পাউলোর বিখ্যাত রাটানটান ইনস্টিটিউট একটা তিনদিনব্যাপী বিজ্ঞান সম্মেলনের আয়োজন করেছেন, যেখানে বক্তৃতা, আলোচনা-সভা ইত্যাদি তো হবেই, তা ছাড়া সম্মেলনের শেষ দিনে ইনস্টিটিউট আমাকে ডক্টরেট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করবে। কসমসের প্রবন্ধই আসলে নতুন করে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছে বিজ্ঞানের জগতে। সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ যে শুধু আমার উপস্থিতি প্রার্থনা করেছেন তা নয়, আমার সব ক'টি ইনভেনশন এবং সেই সঙ্গে সেই সংক্রান্ত আমার গবেষণার কাগজপত্রের একটি প্রদর্শনী করবেন বলে প্রস্তাব করেছেন। এ ব্যাপারে দিল্লির ব্রেজিলীয় এমব্যাসির সঙ্গে ভারত সরকার সবরকম সহায়তা করতে প্রস্তুত আছেন বলে জানিয়েছেন। ইনস্টিটিউট জানিয়েছেন যে, তাঁদের আতিথেয়তা তিন দিনেই ফুরিয়ে যাচ্ছে না, অন্তত আরো সাত দিন থেকে যাতে আমি ব্রেজিল ঘুরে দেখতে পারি সে-ব্যবস্থাও কর্তৃপক্ষ করবেন। দু'জনের জন্য থাকার এবং যাতায়াতের খরচ তাঁরা বহন করবেন।

আমি যাব বলে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি, আর এও জানিয়ে দিয়েছি যে, আমার সঙ্গে থাকবেন আমার সেক্রেটারি মিঃ এন সি বিসওয়াস।

মাকড়দাতেও অবিশ্যি চিঠি চলে গেছে। কনফারেন্স শুরু হচ্ছে ১০ই অক্টোবর। এই এক মাসের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে ফেলতে পারব বলে মনে হয়।

সন্ডার্স ও ক্রোলকে খবরটা দিয়ে দিয়েছি। লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসাবে

দু'জনেই সাও পাউলোতে আমন্ত্রিত হবেন বলে আমার বিশ্বাস, তবে নকুড়বাবুর খবরটা জানিয়ে দেওয়া দরকার ছিল। তাকে নিয়ে এ যাত্রা বিশেষ মাতামাতি করা যাবে না সেটাও জানিয়ে দিয়েছি। ক্রোল নিজে অতিপ্রাকৃত ব্যাপার নিয়ে যথেষ্ট কৌতূহলী ও ওয়াকিবহাল। হোটেলের ঘরে বসে বিশেষ করে তাঁর জন্য সামান্য ডেমনস্ট্রেশন দিতে নকুড়বাবুর নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না।

আমার আসন্ন বিপদের কথাটা সত্যি কি মিথ্যে জানি না। আমার মনে-মনে একটা সন্দেহ হচ্ছে যে, নকুড়বাবু নিখরচায় বিদেশ দেখার লোভটা সামলাতে পারেননি। আমি লিখেছি তিনি যেন রওনা হবার অন্তত তিন দিন আগে আমার কাছে চলে আসেন। তাঁর আদবকায়দার দৌড় কতটা সেটা একবার দেখে নেওয়া দরকার। ভাষা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। ইংরিজিটা মনে হয় ভদ্রলোক একরকম নিজেই চালিয়ে নিতে পারবেন ; আর, কোনো বিশেষ অবস্থায় যদি ব্রেজিলের ভাষা পর্তুগীজ বলার প্রয়োজন হয়, তার জন্য তো আমিই আছি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে পর্তুগীজদের ভূমিকার কথা মনে করে আমি এগারো বছর বয়সে গিরিডির পর্তুগীজ পাদরি ফাদার রেবেলোর কাছ থেকে ভাষাটা শিখে নিয়েছিলাম।

২রা অক্টোবর

আজ নকুড়বাবু এসেছেন। এই ক'মাসে ভদ্রলোকের চেহারায় বেশ একটা উন্নতি লক্ষ করছি। বললেন যোগব্যায়ামের ফল। ইতিমধ্যে কলকাতায় গিয়ে ভদ্রলোক দুটো স্যুট করিয়ে এনেছেন, সেই সঙ্গে শার্ট-টাই-জুতো-মোজা ইত্যাদিও জোগাড় হয়েছে। দাঁতনের অভ্যাস বলে টুথপেস্ট টুথব্রাশ কিনতে হয়েছে। স্যুটকেস যেটা এনেছেন সেটা নাকি আসলে উকিল শিবরতন মল্লিকের। সেটি যে এনার কাছে কী করে এল সেটা আর জিগ্যেস করলাম না।

"ব্রেজিলের জঙ্গল দেখতে যাবেন না ?" আজ দুপুরে খাবার সময় প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক। আমি বললাম, "সাত দিন তো ঘুরিয়ে দেখাবে বলেছে ; তার মধ্যে অরণ্য কি আর একেবারে বাদ পড়বে ?"

নকুড়বাবু বললেন, "আমাদের শ্রীগুরু লাইব্রেরিতে খোঁজ করে বরদা বাঁড়ুজ্যের লেখা ছবিটবি দেওয়া একটা পুরানো বই পেলাম ব্রেজিল সম্বন্ধে। তাতে লিখেছে ওখানকার জঙ্গলের কথা, আর লিখেছে সেই জঙ্গলে একরকম সাপ আছে যা নাকি লম্বায় আমাদের অজগরের ডবল।"

মোট কথা ভদ্রলোক বেশ খোশমেজাজে আছেন। এখনো পর্যন্ত কোনো নতুন ক্ষমতার পরিচয় দেননি। সত্যি বলতে কী, সে-প্রসঙ্গ আর উত্থাপনই করেননি।

ক্রোল ও সন্ডার্স দু'জনেই সাও পাউলো যাচ্ছে বলে লিখেছে। বলা বাহুল্য

দু'জনেই নকুড়বাবুকে দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

১০ই অক্টোবর, সাও পাউলো, রাত সাড়ে এগারোটা

সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে, কনফারেন্সের কর্ণধার প্রোফেসর রডরিগেজের বাড়িতে ডিনার খেয়ে আধ ঘণ্টা হল ফিরেছি হোটেলে। শহরের প্রান্তে সমুদ্রের ধারে পৃথিবীর বহু বিখ্যাত হোটেলকে হার মানানো এই গ্র্যান্ড হোটেল। আমন্ত্রিতরা সকলেই এখানে উঠেছেন। আমাকে দেওয়া হয়েছে একটি বিশাল সুসজ্জিত 'সুইট'—নম্বর ৭৭৭। আমার সেক্রেটারি নকুড় বিশ্বাস একই তলায় আছেন ৭১২ নং সিঙ্গল রুমে।

এখানকার কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে ক্রোল ও সন্ডার্সও গিয়েছিল এয়ারপোর্টে আমাকে রিসীভ করতে। সেখানেই নকুড়বাবুর সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দিই। ক্রোলের সঙ্গে পরিচয় হতেই নকুড়বাবু জার্মান ভদ্রলোকটির দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললেন, "আলপস—বাভারিয়ান আলপস—নাইনটীন থার্টি টু—ইউ অ্যান্ড টু ইয়ং মেন ক্লাইমবিং, ক্লাইমবিং, ক্লাইমবিং—দেন স্লিপিং, স্লিপিং, স্লিপিং—দেন—উফ্‌ফ্—ভেরি ব্যাড !"

ক্রোল দেখি মুখ হাঁ করে সম্মোহিতের মতো চেয়ে আছে নকুড়বাবুর দিকে। তারপর আর থাকতে না পেরে জার্মান ভাষাতেই চেঁচিয়ে উঠল—"আমার পা হড়কে গিয়েছিল। আমাকে বাঁচাতে গিয়ে হারম্যান ও কার্ল দু'জনেরই প্রাণ যায় !"

কথাটা বাংলায় অনুবাদ করে দিতে নকুড়বাবুও বাংলায় বললেন, "দৃশ্যটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। বলতে চাইনি। বড় মর্মান্তিক ঘটনা ওঁর জীবনের।"

বলা বাহুল্য, ক্রোলকে আমার আর মুখে কিছু বলতে হয়নি। আমি জানি সন্ডার্স এ-ধরনের ক্ষমতা সম্পর্কে বেশ খানিকটা সন্দেহ পোষণ করে। সে প্রথমে কোনো মন্তব্য করেনি ; এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার পথে গাড়িতে আমার পাশে বসে একবার শুধু জিগ্যেস করল, "ক্রোলের যুবা বয়সের এ-ঘটনাটা তুমি জানতে ?"

আমি মাথা নেড়ে "না" বললাম।

এর পরে আর এ নিয়ে কোনো কথা হয়নি।

আজ ডিনারে প্রোঃ রডরিগেজের সেক্রেটারি মিঃ লোবোর সঙ্গে আলাপ হল। এখানকার অনেকেরই গায়ের রং যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, আর চোখের মণি এবং মাথার চুল কালো। মিঃ লোবোও এর ব্যতিক্রম নন। বেশ চালাক-চতুর ভদ্রলোক। ইংরিজিটাও মোটামুটি ভালো জানেন, ঘণ্টাখানেকের আলাপেই

আমাদের সঙ্গে বেশ মিশে গেছেন। তাঁকে বললাম যে, আমাদের খুব ইচ্ছে কনফারেন্সের পর ব্রেজিলের জঙ্গলের কিছুটা অংশ ঘুরে দেখা। "নিশ্চয়, নিশ্চয় !" বললেন মিঃ লোবো, যদিও বলার ঢঙে কোথায় যেন একটা কৃত্রিমতার আভাস পেলাম। আসলে এঁরা হয়ত চাইছেন অতিথিদের ব্রেজিলের আধুনিক সভ্যতার নিদর্শনগুলি দেখাতে।

আজ আলোচনা-সভায় আমি ইংরিজিতে বক্তৃতা করেছিলাম। আমার সেক্রেটারি সে-বক্তৃতার সম্পূর্ণটাই শর্টহ্যান্ডে লিখে রেখেছেন। আমি জানি আজকের দিনে টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে বক্তৃতা তুলে রাখাটাই সবচেয়ে সহজ ও নির্ভরযোগ্য উপায় ; কিন্তু নকুড়বাবু এত কষ্ট করে পিটম্যান শিখে এসেছেন, তাই মনে হল তাঁকে সেটার সদ্ব্যবহার করতে দেওয়াটাই ভাল।

আমার আবিষ্কার ও সেই সংক্রান্ত গবেষণার কাগজপত্রের প্রদর্শনীও আজই খুলল। যে-সব জিনিস এতকাল গিরিডিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে আমার আলমারির মধ্যে পড়ে ছিল, সেগুলো হঠাৎ আজ পৃথিবীর বিপরীত গোলার্ধে

ব্রেজিলের শহরের প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে দেখতে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল। সত্যি বলতে কী, একটু যে ভয়ও করছিল না তা নয়, যদিও ব্রেজিল সরকার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন ভালই। প্রদর্শনীর দরজার বাইরে এবং রাটানটান ইনস্টিটিউটের ফটকে সশস্ত্র পুলিশ। কাজেই ভয়ের কারণ নেই।

১২ই অক্টোবর, সকাল সাড়ে ছ'টা

গতকাল বেশ কয়েকটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে গেল।

কাল লাঞ্চের পর আমি আমার দুই বিদেশী বন্ধু ও সেক্রেটারি সমেত শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম। কিছু কেনাকাটা সেরে বিকেলে হোটেলে ফিরে নকুড়বাবু তাঁর ঘরে চলে গেলেন। এটা লক্ষ করছি যে, ঠিক যতটুকু সময় আমার সঙ্গে না থাকলে নয়, তার এক মিনিটও বেশি থাকেন না ভদ্রলোক। ক্রোল আর সন্ডার্সও আমার ঘরে বসে কফি খেয়ে যে যার ঘরে চলে গেল ; কথা হল স্নান করে এক ঘণ্টার মধ্যে হোটেলের লবিতে জমায়েত হয়ে একসঙ্গে যাব এখানকার এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে।

ব্রেজিলের কফির তুলনা নেই, তাই আমি নিজের জন্যে সবে আর-এক পেয়ালা ঢেলেছি, এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল। হ্যালো বলাতে উলটো দিক থেকে বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন এল—

"ইজ দ্যাট প্রোফেসর শ্যাঙ্কু ?"

আমি জানালাম আমিই সেই ব্যক্তি।

"দিস ইজ সলোমন ব্লুমগার্টেন।"

নামটা মনে পড়ে গেল। ইনিই গিরিডিতে চিঠি লিখে আমার তিনটে আবিষ্কারের পেটেন্ট স্বত্ব কেনার প্রস্তাব করেছিলেন।

"চিনতে পেরেছ আমাকে ?" প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক।

"বিলক্ষণ।"

"একবার আসতে পারি কি ? আমি এই হোটেলের লবি থেকেই ফোন করছি।"

আমার মুশকিল হচ্ছে কী, এসব অবস্থায় সরাসরি কিছুতেই না বলতে পারি না, যদিও জানি এঁর সঙ্গে কথা বলে কোনো লাভ নেই। অগত্যা ভদ্রলোককে আসতেই বলতে হল।

মিনিট তিনেক পরে যিনি আমার ঘরে প্রবেশ করলেন, ঠিক তেমন একজন মানুষকে আর কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ভাগ্যে তৃতীয় ব্যক্তি কেউ নেই ঘরে ; থাকলে সব দিক দিয়েই প্রমাণ সাইজের প্রায় দেড়া এই মানুষটির পাশে আমার মতো একজন মিনি-মানুষকে দেখে তিনি কখনই হাসি সংবরণ

করতে পারতেন না।

দাঁড়ানো অবস্থায় এনার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব, তাই করমর্দনের ঠেলা কোনোমতে সামলে বললাম, "বসুন, মিঃ ব্লুমগার্টেন।"

"কল মি সল।"

চোখের সামনে থেকে পাহাড় সরে গেল। ভদ্রলোক আসন গ্রহণ করেছেন।

"কল মি সল," আবার বললেন ভদ্রলোক, "অ্যান্ড আইল কল ইউ শ্যাঙ্ক, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড।"

সল অ্যান্ড শ্যাঙ্ক। সলোমন ও শঙ্কু। এত চট-সৌহার্দ্যের প্রয়োজন কী জানি না, তবে এটা জানি যে এ-ধরনের প্রস্তাবে "হ্যাঁ" বলা ছাড়া গতি নেই। বললাম, "বলো, সল, কী করতে পারি তোমার জন্য।"

"তোমাকে তো বলেইছি চিঠিতে। সেই একই প্রস্তাব আবার করতে এসেছি আমি। আজ তোমার প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম। কিছু মনে কোরো না,—তোমার এইসব আশ্চর্য আবিষ্কার বিশ্বের কাছে গোপন রেখে তুমি অত্যন্ত স্বার্থপর কাজ করেছ।"

দানবাকৃতি মানুষটি বসে পড়াতে আমার স্বাভাবিক মনের জোর অনেকটা ফিরে এসেছে। বললাম, "তুমি কি মানব-কল্যাণের জন্য এতই ব্যগ্র? আমার তো মনে হয় তুমি আবিষ্কারগুলোর ব্যবসার দিকটাই দেখছ, তাই নয় কি?"

মুহূর্তের জন্য সলোমন ব্লুমগার্টেনের লোমশ ভুরু দুটো নিচে নেমে এসে চোখ দুটোকে প্রায় ঢেকে ফেলে আবার তখনই যথাস্থানে ফিরে গেল।

"আমি ব্যবসায়ী, শ্যাঙ্ক, তাই ব্যবসার দিকটা দেখব তাতে আশ্চর্যের কী? কিন্তু তোমাকে বঞ্চিত করে তো নয়! তোমাকে আমি এক লাখ ডলার দিতে প্রস্তুত আছি ওই তিনটি আবিষ্কারের স্বত্বের জন্য। চেক-বই আমার সঙ্গে আছে। নগদ টাকা চাও, তাও দিতে পারি—তবে এতগুলো টাকা সঙ্গে নিয়ে তোমারই অসুবিধা হবে।"

আমি মাথা নাড়লাম। চিঠিতে যে-কথা বলেছিলাম, সেটাই আবার বললাম যে, আমার এই জিনিসগুলো কোনোটাই মেশিনের সাহায্যে কারখানায় তৈরি করা সম্ভব নয়।

গভীর সন্দেহের দৃষ্টিতে ব্লুমগার্টেন চেয়ে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ সটান আমার দিকে। তারপর গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন চারটি ইংরিজি শব্দ।

"আই ডোন্ট বিলীভ ইউ।"

"তাহলে আর কী করা যায় বলো!"

"আই ক্যান ডাবল মাই প্রাইস, শ্যাঙ্ক!"

কী মুশকিল! লোকটাকে কী করে বোঝাই যে, আমি দিব্যি আছি, আমার আর

টাকার দরকার নেই, এক লক্ষের জায়গায় বিশ লাখ পেলেও আমি স্বত্ব বিক্রি করব না।

ভদ্রলোক কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেখি আমার সেক্রেটারি।

"ইয়ে—" ভারী কিন্তু-কিন্তু ভাব করে ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে এলেন।—"কাল সকালের প্রোগ্রামটা—?"

এইটুকু বলে ব্লুমগার্টেনের দিকে চোখ পড়াতে নকুড়বাবু হঠাৎ কথার খেই হারিয়ে ফেললেন।

ভারী অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। ব্লুমগার্টেনকে হঠাৎ দেখলে অনেকেরই কথার খেই হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু নকুড়বাবু যেন শুধু হারাননি; সেই সঙ্গে কিছু যেন পেয়েওছেন তিনি।

"কালকের প্রোগ্রামের কথা জানতে চাইছিলেন কি?"

পরিস্থিতিটাকে একটু সহজ করার জন্য প্রশ্নটা করলাম আমি।

প্রশ্নের উত্তরে যে-কথাটা নকুড়বাবুর মুখ দিয়ে বেরোল সেটা বর্তমান ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। ব্লুমগার্টেনের দিক থেকে চোখ না সরিয়েই ভদ্রলোক মৃদু স্বরে দুবার 'এল ডোরাডো' কথাটা উচ্চারণ করে কেমন যেন হতভম্বভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

"হু ওয়াজ দ্যাট ম্যান?"

আমি দরজা বন্ধ করার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রশ্নটা করলেন সলোমন ব্লুমগার্টেন।

আমি বললাম, "আমার সেক্রেটারি।"

"এল ডোরাডো কথাটা বলল কেন হঠাৎ?"

ব্লুমগার্টেনের ধাঁধালো ভাবটা আমার কাছে অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। বললাম, "দক্ষিণ আমেরিকা সম্বন্ধে পড়াশুনা করছেন ভদ্রলোক, কাজেই এল ডোরাডো নামটা জানা কিছুই আশ্চর্য নয়।"

সোনার শহর এল ডোরাডোর কিংবদন্তীর কথা কে না জানে? ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেন থেকে কোর্টেজের সৈন্য দক্ষিণ আমেরিকায় এসে স্থানীয় অধিবাসীদের যুদ্ধে হারিয়ে এদেশে স্পেনের আধিপত্য বিস্তার করে। তখনই এখানকার উপজাতিদের মুখে এল ডোরাডোর কথা শোনে স্পেনীয়রা, আর তখন থেকেই এ নাম চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে ধনলিপ্সু পর্যটকদের। ইংল্যান্ডের স্যার ওয়লটর র‍্যালে পর্যন্ত এল ডোরাডোর টানে নৌবহর নিয়ে হাজির হয়েছিলেন এই দেশে। কিন্তু এল ডোরাডো চিরকালই অন্বেষণকারীদের ফাঁকি দিয়ে এসেছে। পেরু বোলিভিয়া কোলোম্বিয়া ব্রেজিল আর্জেনটিনা—দক্ষিণ আমেরিকার কোনো দেশেই এল ডোরাডোর কোনো সন্ধান মেলেনি।

ব্লুমগার্টেন হতবাক্ হয়ে টেবিল ল্যাম্পের দিকে চেয়ে রয়েছে দেখে আমি বাধ্য হয়েই বললাম, "আমাকে বেরোতে হবে একটু পরেই ; কাজেই তোমার যদি আর কিছু বলার না থাকে তাহলে—"

"ভারতীয়রা তো জাদু জানে ?" আমার কথা চাপা দিয়ে প্রশ্ন করল ব্লুমগার্টেন।

আমি হেসে বললাম, "তাই যদি হত, তাহলে ভারতে এত দারিদ্র্য থাকত কি ? জাদু জানলেও নিজেদের অবস্থার উন্নতি করার জাদু তারা নিশ্চয়ই জানে না।"

"সে তো তোমাকে দিয়েই বুঝতে পারছি," ব্যঙ্গের সুরে বলল ব্লুমগার্টেন, "যে-দেশের লোক টাকা হাতে তুলে দিলেও সে-টাকা নেয় না, সে-দেশ গরিব থাকতে বাধ্য। কিন্তু…"

ব্লুমগার্টেন আবার চুপ, আবার অন্যমনস্ক। আমার আবার অসহায় ভাব ; এ লোকটাকে তাড়ানোর রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না।

"জাদুর কথা বলছি এই কারণে," বলল ব্লুমগার্টেন, "আমার যে-মুহূর্তে এল ডোরাডোর কথাটা মনে হয়েছে, সেই মুহূর্তে নামটা কানে এল ওই ভদ্রলোকের মুখ থেকে। আজ থেকে দুশো বছর আগে আমার পূর্বপুরুষরা পর-পর তিন পুরুষ ধরে উত্তর আমেরিকা থেকে এদেশে পাড়ি দিয়েছে এল ডোরাডোর সন্ধানে। আমি নিজে দুবার এসেছি যুবা-বয়সে। পেরু, বোলিভিয়া, গুইয়ানা, ইকুয়েডর, ভেনিজুয়েলা—কোনো দেশে খোঁজা বাদ দিইনি। শেষে ব্রেজিলে এসে জঙ্গলে ঘুরে ব্যারাম বাধিয়ে বাধ্য হয়ে এল ডোরাডোর মায়া ত্যাগ করে দেশে ফিরে যাই। আজ এতদিন পরে আবার ব্রেজিলে এসে কাল থেকে মাঝে-মাঝে এল ডোরাডোর কথাটা মনে পড়ে যাচ্ছে, আর আজ…"

আমি কোনো মন্তব্য করলাম না। ব্লুমগার্টেনও উঠে পড়ল। বলল, "আমি ম্যারিনা হোটেলে আছি। যদি মত পরিবর্তন করো তো আমাকে জানিও।"

ক্রোল আর সন্ডার্সকে ঘটনাটা বলতে তারা দুজনেই রেগে আগুন। সন্ডার্স বলল, "তুমি অতিরিক্ত রকম ভদ্র, তাই এইসব লোকের ঔদ্ধত্য হজম করো। এবার এলে আমাদের একটা ফোন করে দিও, আমরা এসে যা করার করব।"

এর পরের ঘটনাটা ঘটল মাঝরাত্তিরে। পরে ঘড়ি দেখে জেনেছিলাম তখন সোয়া দুটো। ঘুম ভাঙল কলিং বেলের শব্দে। বিদেশ-বিভুঁইয়ে এত রাত্তিরে আমার ঘরে কে আসতে পারে ?

দরজা খুলে দেখি শ্রীমান নকুড় বিশ্বাস। ফ্যাকাশে মুখ, ত্রস্ত ভাব।

"অপরাধ নেবেন না তিলুবাবু, কিন্তু না এসে পারলাম না।"

ভদ্রলোকের চেহারাটা ভাল লাগছিল না, তাই বললাম, "আগে বসুন, তারপর কথা হবে।"

সোফায় বসেই নকুড়বাবু বললেন, "কপি হয়ে গেল।"

কপি ? কিসের কপি ? এত রাত্তিরে এসব কী বলতে এসেছেন ভদ্রলোক ?

"যন্ত্রটার নাম জানি না," বলে চললেন নকুড়বাবু, "তবে চোখের সামনে দেখতে পেলাম। একটা বাক্সর মতো জিনিস, ভিতরে আলো জ্বলছে, ওপরে একটা কাঁচ। একটা কাগজ পুরে দেওয়া হল যন্ত্রে ; তারপর একটা হাতল ঘোরাতেই কাগজের লেখা অন্য একটা কাগজে হুবহু নকল হয়ে বেরিয়ে এল।"

শুনে মনে হল ভদ্রলোক জীরক্স ডুপলিকেটিং যন্ত্রের কথা বলছেন।

"কী কাগজ ছাপা হল ?" প্রশ্ন করলাম আমি।

নকুড়বাবুর দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে। একটা আতঙ্কের ভাব দেখা দিয়েছে মুখে।

"কী ছাপা হল ?" আবার জিগ্যেস করলাম।

নকুড়বাবু এবার মুখ তুলে চাইলেন আমার দিকে। সংশয়াকুল দৃষ্টি।

"আপনার আবিষ্কারের সব ফরমুলা," চাপা গলায় দৃষ্টি বিস্ফারিত করে বললেন নকুড়বাবু।

আমি না-হেসে পারলাম না।

"আপনি এই বলতে এসেছেন এত রাত্তিরে ? আমার ফরমুলা প্রদর্শনীর ঘর থেকে বেরোবে কী করে ? সে তো—"

"ব্যাঙ্ক থেকে টাকা চুরি হয় না ? দলিল চুরি হয় না ?" প্রায় ধমকের সুরে বললেন নকুড়বাবু। "আর ইনি যে ঘরের লোক। ঘরের লোককে পুলিশই বা আটকাবে কেন ?"

"ঘরের লোক ?"

"ঘরের লোক, তিলুবাবু। মিস্টার লোবো !"

আমার মনে হল ভয়ঙ্কর আবোল-তাবোল বকছেন নকুড়বাবু। বললাম, "এসব কি আপনি স্বপ্নে দেখলেন ?"

"স্বপ্ন নয় !" গলার স্বর তিন ধাপ চড়িয়ে বললেন নকুড়বাবু। "চোখের সামনে জলজ্যান্ত দেখতে পেলাম এই দশ মিনিট আগে। হাতে টর্চ নিয়ে ঢুকলেন মিঃ লোবো—নিজে চাবি দিয়ে প্রদর্শনীর ঘরের দরজা খুলে। প্রহরী চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখছে। লোবো সোজা চলে গেলেন একটা বিশেষ টেবিলের দিকে—যেটার কাঁচের ঢাকনার তলায় আপনার খাতাপত্তর রয়েছে। ঢাকনা তুলে দুটো খাতা বার করলেন মিঃ লোবো। তারপর অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে উপরের তলার একটা আপিসঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সেইখানে রয়েছে এই যন্ত্র। কী নাম এই যন্ত্রের তিলুবাবু ?"

"জীরক্স," যথাসম্ভব শান্ত স্বরে বললাম আমি। কেন জানি নকুড়বাবুর কথাটা আর অবিশ্বাস করতে পারছি না। কিন্তু মিঃ লোবো !

“আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত, তিলুবাবু,” আবার সেই খুব চেনা কুণ্ঠার ভাব করে বললেন নকুড় বিশ্বাস, “কিন্তু খবরটা আপনাকে না-দিয়ে পারলাম না। অবিশ্যি আমি যখন রয়েছি, তখন আপনার যাতে ক্ষতি না হয় তার যথাসাধ্য চেষ্টা করব। যেটা ঘটতে যাচ্ছে সেটা আগে থাকতে জানতে পারলে একটা মস্ত সুবিধে তো! আসলে নতুন জায়গায় এসে মনটাকে ঠিক সংহত করতে পারছিলাম না, তাই লোবোবাবুর ঘটনাটা আগে থেকে জানতে পারিনি—কেবল বুঝেছিলাম আপনার একটা বিপদ হবে সাও পাউলোতে।”

নকুড়বাবু আবার ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, আর আমিও চিন্তিত-ভাবে এসে বিছানায় শুলাম।

আমার মধ্যে নকুড়বাবুর মতো অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা না-থাকলেও এটা বেশ বুঝতে পারছি যে লোবোর মতো লোকের পক্ষে নিজে থেকে এ-জিনিস করা সম্ভব নয়। তার পিছনে অন্য লোক আছে। পয়সাওয়ালা লোক।

ভাবলে একজনের কথাই মনে হয়।

সলোমন ব্লুমগার্টেন।

১২ই অক্টোবর, রাত পৌনে বারোটা

আজ রাটানটান ইনস্টিটিউট থেকে আমাকে ডক্টরেট দেওয়া হল। মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান, প্রোঃ রডরিগেজ-কে নিয়ে চারজন বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকের আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষণ, ও সবশেষে আমার ধন্যবাদজ্ঞাপন। সব মিলিয়ে মনটা ভারী প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। আজ ডিনারে আমার দুই বন্ধু ও প্রোঃ রডরিগেজের উপরোধে জীবনে প্রথম এক চুমুক শ্যাম্পেন পান করলাম। এটাও একটা ঘটনা বটে।

কাল নকুড়বাবুর মুখে মিঃ লোবোর বিষয় শুনে মনটা বিষিয়ে গিয়েছিল, আজ ভদ্রলোকের অমায়িক ব্যবহারে মনে হচ্ছে নকুড়বাবু হয়ত এবার একটু ভুল করেছেন। প্রদর্শনীতে টুঁ মেরে দেখে এসেছি যে, আমার কাগজপত্র ঠিক যেমন ছিল তেমনই আছে।

হোটেলে ফিরতে-ফিরতে হল এগারোটা। ঢুকেই একটা দৃশ্য দেখে একেবারে হকচকিয়ে যেতে হল।

হোটেলের লবিতে চতুর্দিকেই বসার জন্য সোফা ছড়ানো রয়েছে; তারই একটায় দেখি একপাশে বিশালবপু সলোমন ব্লুমগার্টেন ও অন্যপাশে একটি অচেনা বিদেশী ভদ্রলোককে নিয়ে বসে আছেন আমার সেক্রেটারি শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস।

আমার সঙ্গে চোখাচুখি হতেই নকুড়বাবু একগাল হেসে উঠে এলেন।

“এনাদের সঙ্গে একটু বাক্যালাপ করছিলাম।”

ব্লুমগার্টেনও উঠে এলেন।

“কনগ্র্যাচুলেশনস!”

করমর্দনে যথারীতি হাতব্যথা করিয়ে দিয়ে ব্লুমগার্টেন চোখ কপালে তুলে বললেন, “তুমি কাকে সেক্রেটারি করে নিয়ে এসেছ? ইনি তো অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি! আমার চোখের দিকে চেয়ে আমার নাড়ীনক্ষত্র বলে দিলেন!”

দু'জনের মধ্যে মোলাকাতটা কীভাবে হল সেটা ভাবছি, তার উত্তর নকুড়বাবুই দিয়ে দিলেন।

“আমার বন্ধু যোগেন বকশীর ছেলে কানাইলালকে একটা পোস্টকার্ড লিখে পোস্ট করার জন্য ওই কাউন্টারে দিতে গিয়ে দেখি এনারা পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন। আমায় দেখে ব্লুমগার্টেন সাহেবই এগিয়ে এসে আলাপ করলেন। বললেন কাল আমার মুখে এল ডোরাডোর নাম শুনে ওঁর কৌতূহল হচ্ছে আমি এল ডোরাডো সম্পর্কে কতদূর জানি। আমি বললুম—আই অ্যাম মুখ্যসুখ্যু

ম্যান—নো এডুকেশন—কাল একটা বেঙ্গলি বইয়ে পড়ছিলাম এল ডোরাডোর কথা। তা, পড়তে পড়তে যেন সোনার শহরটাকে চোখের সামনে দেখতে পেলাম। তা ইনি—"

নকুড়বাবুর বাক্যস্রোত বন্ধ করতে হল। ক্রোল ও সন্ডার্সের মুখের ভাব দেখেই বুঝছিলাম তাদের প্রচণ্ড কৌতূহল হচ্ছে ব্যাপারটা জানার জন্য। আমি এ পর্যন্ত যা বলেছেন নকুড়বাবু সেটা ইংরেজি তর্জমা করে সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলাম। ততক্ষণে অবিশ্যি আমরা তিনজনেই একটা পাশের সোফায় বসে পড়েছি, এবং আমি আমার দুই বন্ধুর সঙ্গে ব্লুমগার্টেনের আলাপ করিয়ে দিয়েছি। অন্য বিদেশী ভদ্রলোকটির নাম নাকি মাইক হ্যাচেট। হাবভাবে বুঝলাম ইনি ব্লুমগার্টেনের বডিগার্ড বা ধামাধারী গোছের কেউ।

এবার ব্লুমগার্টেনই কথা বলল।

"ইওর ম্যান বিসওয়াস ইজ এ রিয়্যাল উইজার্ড। ওকে মাইরনের হাতে তুলে দিলে সে রাতারাতি সোনা ফলিয়ে দেবে, অ্যান্ড ইওর ম্যান উইল বি ওনিং এ ক্যাডিল্যাক ইন থ্রী মানথস টাইম!"

মাইরন লোকটি কে জিগ্যেস করাতে ব্লুমগার্টেন চোখ কপালে তুলে বললেন, "হোলি স্মোক!—মাইরনের নাম শোনোনি? মাইরন এন্টারপ্রাইজেজ! অত বড় ইমপ্রেসারিও আর নেই। কত গাইয়ে বাজিয়ে নাচিয়ে জাদুকর মাইরনের ম্যানেজমেন্টের জোরে দাঁড়িয়ে গেল, আর ইনি তো প্রতিভাধর ব্যক্তি।"

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। নকুড়বাবু শেষটায় রঙ্গমঞ্চে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়ে নাম কিনবেন? কই, এমন তো কথা ছিল না!

"অ্যান্ড হি নোজ হোয়্যার এল ডোরাডো ইজ!"

আমি নকুড়বাবুর দিকে দৃষ্টি দিলাম। ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। বললাম, "কী মশাই, আপনি কি সাহেবকে বলেছেন এল ডোরাডো কোথায় তা আপনি জানেন?"

"যেটুকু আমি জানি সেটুকুই বলেছি," কাঠগড়ার আসামির মতো হাত জোড় করে বললেন নকুড় বিশ্বাস। "বলেছি এই ব্রেজিলেই আছে এল ডোরাডো। আমরা যেখানে আছি তার উত্তর-পশ্চিমে। একটি পাহাড়ে ঘেরা উপত্যকার ঠিক মধ্যিখানে এক গভীর জঙ্গল, সেই জঙ্গলের মধ্যেই এই শহর। কেউ জানে না এ শহরের কথা। মানুষজন বলতে আর কেউ নেই সেখানে। পোড়ো শহর, তবে রোদ পড়লে এখনো সোনা ঝলমল করে। সোনার তোরণ, সোনার পিরামিড, যেখানে-সেখানে সোনার স্তম্ভ, বাড়ির দরজা-জানালা সব সোনার। সোনা তো আর নষ্ট হয় না, তাই সে-সোনা এখনো আছে। লোকজন যা ছিল, হাজার বছর আগে সব লোপ পেয়ে যায়। একবার খুব বর্ষা হয়; তার পরেই জঙ্গলে এক

মারাত্মক পোকা দেখা দেয়; সেই পোকা থেকেই মড়ক। বিশ্বাস করুন তিলুবাবু, এ সবই আমি পর পর চোখের সামনে বায়োস্কোপের ছবির মতো দেখতে পেলুম।"

ক্রোল ও সন্ডার্সের জন্য এই অংশটুকু ইংরিজিতে অনুবাদ করে দিয়ে ব্লুমগার্টেনকে বললাম, "তুমি তো তাহলে এল ডোরাডোর হদিস পেয়ে গেলে; এবার অভিযানের তোড়জোড় করো। আমরা আপাতত ক্লান্ত, কাজেই আমাদের মাপ করো।—আসুন নকুড়বাবু।"

আমার কথায় ব্লুমগার্টেনের মুখে যে থমথমে ভাবটা দেখা দিল, সেটা যে-কোনো লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করত। আমি সেটা যেন দেখেও দেখলাম না। নকুড়বাবু উঠে এলেন ভদ্রলোকের পাশ ছেড়ে।

আমরা চারজনে গিয়ে বসলাম আমার ঘরে। নকুড়বাবুর ইচ্ছে ছিল সোজা নিজের ঘরে চলে যান, কিন্তু আমি বললাম যে, তাঁর সঙ্গে আমার একটু কথা আছে। দুই সাহেব বন্ধুর কাছে বাংলা বলার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে নকুড়বাবুকে বললাম, "দেখুন, মশাই, আমি আপনার ভালর জন্যই বলছি, আপনার মধ্যে যে ক্ষমতাটা আছে সেটা যার-তার কাছে এভাবে প্রকাশ করবেন না। আপনার অভিজ্ঞতা কম, আপনি হয়ত লোক চেনেন না, কিন্তু এটা বলে দিচ্ছি যে, এই ব্লুমগার্টেনের খপ্পরে পড়লে আপনার সর্বনাশ হবে। আপনাকে অনুরোধ করছি—আমাকে না-জানিয়ে ফস করে একটা কিছু করে বসবেন না।"

নকুড়বাবু লজ্জায় প্রায় কার্পেটের সঙ্গে মিশে গেলেন। বললেন, "আমায় মাপ করবেন তিলুবাবু; আমার সত্যিই অপরাধ হয়েছে। আসলে বিদেশে তো আসিনি কখনো! মফস্বলে মানুষ, তাই হয়ত মাথাটা একটু ঘুরে গিয়ে থাকবে। আমাকে সাবধান করে দিয়ে আপনি সত্যিই খুব উপকার করলেন।"

নকুড়বাবু উঠে পড়লেন।

ভদ্রলোক চলে যাবার পর ক্রোল তার পাইপে টান দিয়ে এক ঘর ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "এল ডোরাডো যদি সত্যিই থেকে থাকে, তাহলে সেটা আমাদের একবার দেখে আসা উচিত নয় কি?"

আগেই বলেছি, সন্ডার্স এসব ব্যাপারে ঘোর সন্দেহবাদী। সে ধমকের সুরে বলল, "দেখ হে জার্মান পণ্ডিত, তিন শো বছর ধরে সোনার-স্বপ্নদেখা অজস্র লোক দক্ষিণ আমেরিকা চষে বেড়িয়েও এল ডোরাডোর সন্ধান পায়নি, আর এই ভদ্রলোকের এই ক'টা কথায় তুমি মেতে উঠলে? ওই অতিকায় ইহুদী যদি এসব কথায় বিশ্বাস করে জঙ্গলে গিয়ে জাগুয়ারের শিকার হতে চান, তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমি এর মধ্যে নেই। আমাদের যা প্ল্যান হয়েছে তার একচুল এদিক-ওদিক হয় এটা আমি চাই না। আমার বিশ্বাস শঙ্কুও এ-বিষয়ে

আমার সঙ্গে একমত।"

আমি মাথা নেড়ে সন্ডার্সের কথায় সায় দিলাম। আমাদের প্ল্যান হল আমরা কাল সকালে ব্রেকফাস্টের পর প্লেনে করে চলে যাব উত্তরে, ব্রেজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়া শহরে। সেখানে একদিন থেকে ছোট প্লেন ধরে আমরা চলে যাব জিঙ্গু ন্যাশনাল পার্কের উত্তর প্রান্তে পোস্টো ডিয়াউয়ারুম শহরে। তারপর বাকি অংশ নদীপথে। জিঙ্গু নদী ধরে নৌকা করে আমরা যাব পোরোরি গ্রামে। পোরোরিতে ব্রেজিলের এক আদিম উপজাতি চুকাহামাই-দের কিছু লোক এখনো রয়েছে, যারা এই সেদিন পর্যন্ত ছিল প্রস্তরযুগের মানুষ। ব্রাসিলিয়া থেকেই আমাদের সঙ্গে থাকবেন একজন বিশেষজ্ঞ, যাকে এখানকার ভাষায় বলা হয় সেরটানিস্টা। কথাটার মানে হল অরণ্য-অভিজ্ঞ। সেরটানিস্টারা উপজাতিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে অগ্রণী ; তাদের ভাষা থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই এরা খুব ভাল ভাবে জানে।

পোরোরি ছেড়ে আরো খানিকটা পথ উত্তরে গিয়ে ভন মার্টিয়ুস জলপ্রপাত দেখে আবার ব্রাসিলিয়া ফিরে এসে সেখান থেকে প্লেন ধরে যে যার দেশে ফিরব। দিন সাতেকের মধ্যে পুরো সফর হয়ে যাওয়া উচিত, তবে ব্রেজিল সরকার বলেছেন প্রয়োজনে আতিথেয়তার মেয়াদ তিনদিন পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে প্রস্তুত আছেন তাঁরা।

সাড়ে এগারোটা বাজে, তাই ক্রোল ও সন্ডার্স উঠে পড়ল। ক্রোল যে আমাদের দু'জনের সঙ্গে একমত নয়, সেটা সে যাবার আগে জানিয়ে দিয়ে গেল দরজার মুখটাতে দাঁড়িয়ে।

"আমার অবাক লাগছে, শঙ্কু, যে তুমি তোমার এত কাছের লোককে চিনতে পারছ না। তোমার এই সেক্রেটারিটির চোখের দৃষ্টিই আলাদা। হোটেলের লবিতে বসে যখন সে এল ডোরাডোর বর্ণনা দিচ্ছিল, তখন আমি ওর চোখ থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না।"

সন্ডার্স কথাটা শুনে আমার দিকে চেয়ে চোখ টিপে হাতে গেলাস ধরার মুদ্রা করে বুঝিয়ে দিল যে, ক্রোল আজ পার্টিতে শ্যাম্পেনটা একটু বেশি খেয়েছে।

বারোটা বেজে গেছে। শহর নিস্তব্ধ। শুয়ে পড়ি।

১৩ই অক্টোবর, হোটেল ক্যাপিটল, ব্রাসিলিয়া, দুপুর আড়াইটা

আমরা ঘণ্টাখানেক হল এখানে পৌঁছেছি। আমরা মানে আমরা তিন বন্ধু ও মিঃ লোবো। লোবো পুরো সফরটাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমি অন্তত এক মুহূর্তের জন্যও সৌজন্যের কোনো অভাব লক্ষ করিনি ভদ্রলোকের ব্যবহারে।

এখানে নকুড়বাবুর কথাটা স্বভাবতই এসে পড়ে, যদিও কোনো প্রসঙ্গের

দরকার ছিল না। সোজা বাংলায় বলতে গেলে ভদ্রলোক আমাকে লেঙ্গি মেরেছেন, এবং সেটা যে টাকার লোভে সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

আজ সাও পাউলোতে আমার রুম বয় সকালের কফির সঙ্গে একটা চিঠি এনে দিল। বাংলা চিঠি, আর হস্তাক্ষর আমার চেনা। আগেরটার তুলনায় বলতেই হয় এটার ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ। এই হল চিঠি—

প্রিয় তিলুবাবু,

অধমের অপরাধ লইবেন না। নগদ পাঁচ হাজার ডলারের লোভ সংবরণ করা সম্ভবপর হইল না। আমার পিতামহী আজ চারি বৎসর যাবৎ এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী। আমি সাড়ে আট বৎসর বয়সে আমার মাতৃদেবীকে হারাই। তখন হইতে আমি আমার পিতামহীর দ্বারাই লালিত। শুনিয়াছি এ-দেশে এই রোগের এক আশ্চর্য নূতন ঔষধ বাহির হইয়াছে। ঔষধের মূল্য অনেক। ব্লুমগার্টেন সাহেবের বদান্যতায় এই মহার্ঘ ঔষধ কিনিয়া দেশে ফিরিবার সৌভাগ্য হইবে আমার।

আজ সকালেই আমরা ব্লুমগার্টেন মহাশয়ের ব্যক্তিগত হেলিকপটার বিমানে রওনা হইতেছি। আমাদের লক্ষ্য সাও পাউলোর সাড়ে তিন শো মাইল উত্তর-পশ্চিমে একটি অরণ্য অঞ্চল। এই অরণ্যের মধ্যেই এল ডোরাডো অবস্থিত। আমার সাহায্য ব্যতীত ব্লুমগার্টেন মহোদয় কোনোক্রমেই এল ডোরাডো পঁহুছিতে পারিবেন না। তাঁহার প্রতি অনুকম্পাবশত আমি নির্দেশ দিতে সম্মত হইয়াছি। আমার কার্য সমাধা হইলেই আমি আপনাদের সহিত মিলিত হইব। আপনাদের যাত্রাপথ আমার জানা আছে।

ঈশ্বর আপনাদিগের মঙ্গল করুন। আমি যদি ঈশ্বরের কৃপায় আপনার কোনোরূপ সাহায্য করিতে পারি, তবে নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। ইতি

দাসানুদাস সেবক
শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস

হোটেলের রিসেপশনে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, নকুড়বাবু সত্যিই বেরিয়ে গেছেন ভোর ছ'টায়। জনৈক বিশালবপু ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে ছিলেন কি ?—আজ্ঞে হ্যাঁ, ছিলেন।

আমার চেয়েও বেশি বিরক্ত হয়েছে সন্ডার্স, এবং সেটা শুধু নকুড়বাবুর উপর নয় ; আমার উপরেও। বলল, "তোমার-আমার মতো লোকের এই ভৌতিক অলৌকিক প্রেতলৌকিক ব্যাপারগুলো থেকে যতদূর দূরে থাকা যায় ততই ভাল।"

ক্রোল কিন্তু ব্যাপারটা শুনে বেশ মুষড়ে পড়েছে ; এবং সেটা অন্য কারণে।

সে বলল, "তোমার লোক যখন বলছে আমাদের আবার মীট করবে, তখন বোঝাই যাচ্ছে যে, এল ডোরাডো আমাদের গন্তব্যস্থল থেকে খুব বেশি দূর নয়। সেক্ষেত্রে আমরাও যে কেন সেখানে যেতে পারি না সেটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না।"

আমি আর সন্ডার্স ক্রোলের এই অভিযোগ কিছু কানে তুললাম না।

ব্রাসিলিয়া ব্রেজিলের রাজধানী হলেও সাও পাউলোর সঙ্গে কোনো তুলনা চলে না। আমরা হোটেলে পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আমাদের দলে যে সেরটানিস্টা বা অরণ্য-অভিজ্ঞ ভদ্রলোকটি যাবেন—নাম হাইটর—তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। বয়স বেশি না হলেও, চেহারায় একটা অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে। তার উপরে ঠাণ্ডা মেজাজ ও স্নিগ্ধ ব্যবহার দেখে মনে হয় উপজাতিদের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য ইনিই আদর্শ ব্যক্তি। তাঁকে আজ ক্রোল জিগ্যেস করেছিল এল ডোরাডোর সম্পর্কে তাঁর কী ধারণা। প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে বললেন, "আজকের দিনে আবার এল ডোরাডোর প্রশ্ন তুলছেন কেন ? সে তো কোনকালে মিথ্যে বলে প্রমাণ হয়ে গেছে। এল ডোরাডো তো শহরই নয় ; আসলে ওটা একজন ব্যক্তি। ডোরাডো কথাটা সোনার শহর বা সোনার মানুষ দুই-ই বোঝায় পর্তুগীজ ভাষায়। সূর্যের প্রতীক হিসেবে কোনো এক বিশেষ ব্যক্তিকে পুরাকালে এখানকার অধিবাসীরা পুজো করত, আর তাকেই বলত এল ডোরাডো।"

চোখের পলকে একজন মানুষকে কখনো এমন হতাশ হতে দেখিনি, যেমন দেখলাম ক্রোলকে।

কাল সকালে আমাদের আবার যাত্রা শুরু। নকুড়বাবু অন্যায় কাজ করেছেন সেটা ঠিকই, কিন্তু তার জন্য আমিই যে বেশ খানিকটা দায়ী সেটাও ভুলতে পারছি না। আমিই তো প্রথম তাঁকে আমার সঙ্গে নিয়ে আসার প্রস্তাবটা করি।

১৬ই অক্টোবর, বিকাল সাড়ে চারটা

বাহারের নকশা করা ক্যানু নৌকাতে জিঙ্গু নদী ধরে আমরা চলে এসেছি প্রায় তেত্রিশ মাইল। আমরা পাঁচজন—অর্থাৎ আমি, ক্রোল, সন্ডার্স, লোবো আর হাইটর—ছাড়া রয়েছে দু'জন নৌকাবাহী দক্ষিণ আমেরিকান ইন্ডিয়ান। আরো দু'জন নৌকাবাহী সহ আরেকটি ক্যানুতে চলেছে আমাদের মালপত্র রসদ ইত্যাদি। এখন আমরা নদীর ধারে একটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জায়গা বেছে সেখানে তাঁবু ফেলেছি। তাঁবুর কাছেই তিনটি গাছে দুটি হ্যামক বাঁধা রয়েছে ; সন্ডার্স ও ক্রোল তার এক-একটি দখল করে তাতে শুয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছে ব্রেজিলের বিখ্যাত অ্যানাকোন্ডা সাপ নিয়ে। এই অ্যানাকোন্ডা যে সময়-সময়

বিশাল আকার ধারণ করে, সেটা অনেক পর্যটকের বিবরণ থেকেই জানা যায়। ক্রোলের মতে ত্রিশ হাত পর্যন্ত লম্বা হওয়া কিছুই আশ্চর্য না। সন্ডার্স সেটা বিশ্বাস করতে রাজি নয়। এখানে বলে রাখি যে, আমাদের তিনজনের কেউই চিড়িয়াখানার বাইরে অ্যানাকোন্ডা দেখিনি। এ-যাত্রায় আমাদের ভাগ্যে অ্যানাকোন্ডার সাক্ষাৎ পাওয়া আছে কিনা জানি না। না থাকলেও, আমার অন্তত তাতে আপসোস নেই। লতাগুল্ম-ফলমূল-কীটপতঙ্গ-পশুপাখিতে ভরা ব্রেজিলের জঙ্গলের যে রূপ আমরা এখন পর্যন্ত দেখেছি, তার কোনো তুলনা নেই। বন গভীর ও অন্ধকার হলেও তাতে রঙের অভাব নেই। প্রায়ই চোখে পড়ে লানটানা ফুলের ঝোপ, হরেক রঙের প্রজাপতি আর চোখ-ঝলসানো সব কাকাতুয়া শ্রেণীর পাখি। নৌকা চলার সময় জলে হাত দেওয়া বারণ, কারণ নদীতে রাক্ষুসে পিরানহা মাছের ছড়াছড়ি। কালই নদীর ধারে একটা কেইম্যান কুমিরের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলাম ; তার মাথার দিকের খানিকটা অংশে ছাড়া আর কোথাও মাংস নেই, শুধু হাড়। মাংস গেছে পিরানহার পেটে।

ব্রেজিলের অনেক অংশেই বহুদিন পর্যন্ত বাইরের মানুষের পা পড়েনি। গত বছর-দশেকের মধ্যে বেশ কিছু জঙ্গল কেটে চাষের জমি বাড়ানো হয়েছে। সেই সঙ্গে ব্রেজিল সরকারের হাইওয়ে বানানোর কাজও চলেছে জঙ্গল কেটে, আর ডিনামাইটের সাহায্যে পাহাড় উড়িয়ে। আমরা আসার পথেও বেশ কয়েকবার ডিনামাইট বিস্ফোরণ বা ব্লাস্টিং-এর শব্দ পেয়েছি। কাল মাঝরাত্রে একটা গুরুগম্ভীর বিস্ফোরণের শব্দে আমাদের ক্যাম্পের সকলেরই ঘুম ভেঙে যায়। শব্দতরঙ্গের চাপ এত প্রবল ছিল যে, ক্রোলের বিয়ার-গ্লাসটা তার ফলে ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল, তাই আজ সকালে হাইটরকে জিগ্যেস করলাম কাছাকাছি কোনো আগ্নেয়গিরি আছে কিনা। হাইটর মুখে কিছু না বলে কেবল গম্ভীরমুখে মাথা নাড়ল।

১৭ই অক্টোবর, ভোর ছ'টা

কাল রাত্রে এক বিচিত্র ঘটনা।

রাত্রে মশা, আর দিনে জ্বালাতুনে ব্যারাকুদা মাছির উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য আমি গিরিডি থেকেই একরকম মলম তৈরি করে এনেছিলাম। তিন বন্ধুতে সেই মলম মেখে সাড়ে ন'টার মধ্যেই যে-যার ক্যাম্পে শুয়ে পড়েছিলাম। যদিও এখানে রাত্রেও নিস্তব্ধতা বলে কিছু নেই, ঝিঁঝি থেকে শুরু করে জাগুয়ার পর্যন্ত সব কিছুরই ডাক শোনা যায়, তবু দিনের ক্লান্তির জন্য ঘুমটা এসে যায় বেশ তাড়াতাড়ি। সেই ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল এক বিকট চিৎকারে।

আমি ও সন্ডার্স হন্তদন্ত আমাদের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে দেখি ক্রোলও তার

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছে, এবং তৃতীয় তাঁবু থেকে হাইটর।

কিন্তু মিঃ লোবো কোথায়?

ক্রোল টর্চটা জ্বালিয়ে এদিক-ওদিক ফেলতেই দেখা গেল ভদ্রলোককে। মুখ বিকৃত করে বিশ হাত দূরে একটা ঝোপের পাশ থেকে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে এগিয়ে আসছেন আমাদের দিকে। আর সেই সঙ্গে পর্তুগীজ ভাষায় পরিত্রাহি ডেকে চলেছেন ভগবান যীশুকে।

"আমার পায়ে দিয়েছে কামড়, আমি আর নেই"—সন্ডার্সের বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন মিঃ লোবো।

কামড়টা মাকড়সার, এবং সেটা ডান পায়ের পাতার ঠিক উপরে। লোবো গিয়েছিলেন একটি ঝোপের ধারে ছোট কাজ সারতে। হাতের সোনার ঘড়ির ব্যান্ডটা নাকি এমনিতেই একটু আলগা ছিল; সেটা খুলে পড়ে যায় মাটিতে। টর্চ জ্বালিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজতে গিয়ে মাকড়সার গর্তে পা পড়ে। কামড়ে বিষ আছে ঠিকই, তবে মারাত্মক নয়। কিন্তু লোবোর ভাব দেখে সেটা বোঝে কার সাধ্যি।

ওষুধ ছিল আমার সঙ্গে; সেটা সন্ডার্সের টর্চের আলোতে লাগিয়ে দিচ্ছি ক্ষতের জায়গায়, এমন সময় লোবোর মুখের দিকে চোখ পড়তে একটা অদ্ভুত ভাব লক্ষ করলাম। তাতে আতঙ্ক ও অনুশোচনার এক বিচিত্র সংমিশ্রণ। তাঁর দৃষ্টি আমারই দিকে।

"কী হয়েছে তোমার?" আমি জিগ্যেস করলাম।

"আমি পাপ করেছি, আমায় ক্ষমা করো।" কাতর কণ্ঠে প্রায় কান্নার সুরে বলে উঠলেন মিঃ লোবো।

"কী পাপের কথা বলছ তুমি?"

মিঃ লোবো দু'হাত দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর ঠোঁট কাঁপছে, চোখে জল। সন্ডার্স ও ক্রোল বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে তাঁর দিকে।

"সেদিন রাত্রে," বললেন মিঃ লোবো, "সেদিন রাত্রে প্রহরীকে ঘুষ দিয়ে প্রদর্শনীতে ঢুকে আমি তোমার গবেষণার নোটসের খাতা বার করে নিয়েছিলাম। তারপর…"

রীতিমত কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে, কিন্তু তাও বলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে লোকটা।

"তারপর… সেগুলোকে জীরক্স করে আবার যথাস্থানে রেখে দিই।"

এবার আমি প্রশ্ন করলাম। "তারপর?"

"তারপর—কপিগুলো—দিয়ে দিই মিঃ ব্লুমগার্টেনকে। তিনি আমায়… টাকা… অনেক টাকা…"

"ঠিক আছে। আর বলতে হবে না।"

মিঃ লোবো একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। "কথাটা বলে…হালকা লাগছে… অনেকটা—এবার নিশ্চিন্তে মরতে পারব।"

"আপনি মরবেন না, মিঃ লোবো," শুকনো গলায় বলল সন্ডার্স। "এ মাকড়সার কামড়ে ঘা হয়, মৃত্যু হয় না।"

মিঃ লোবোর ঘা আমার ওষুধে শুকোবে ঠিকই, কিন্তু তিনি আমার যে ক্ষতিটা করলেন সেটা অপূরণীয়।

শ্রীমান নকুড়চন্দ্র এক বর্ণও ভুল বলেননি।

তার মানে কি এল ডোরাডো সত্যিই আছে?

১৮ই অক্টোবর, রাত দশটা, হোটেল ক্যাপিটল, ব্রাসিলিয়া

আমাদের ব্রেজিল সফরের অপ্রত্যাশিত, অবিস্মরণীয় পরিসমাপ্তির কথাটা এই বেলা লিখে ফেলি, কারণ কাল সকালেই আমরা যে যার দেশে ফিরছি। এটুকু বলতে পারি যে, সন্ডার্সের যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনের ভিত এই প্রথম দেখলাম একটা বড় রকম ধাক্কা খেল। সে মানতে বাধ্য হয়েছে যে, সব ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস, আখেরে এর ফল ভালই হবে।

এইবার ঘটনায় আসি।

গতকাল সকালে ব্যান্ডেজবদ্ধ লোবোকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ক্যানু করে বেরিয়ে পড়লাম চুকাহামাই উপজাতিদের বাসস্থান পোরোরির উদ্দেশে। আমাদের যেতে হবে আরো প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার। যত এগোচ্ছি ততই যেন গাছপালা ফুলফল পাখি প্রজাপতির সম্ভার বেড়ে চলেছে। এই স্বপ্নরাজ্যের মনোমুগ্ধকারিতার মধ্যে আতঙ্কের খাদ মিশে আছে বলে এটা যেন আমার কাছে আরো আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। আমি জানি, এ-ব্যাপারে সন্ডার্স ও ক্রোল আমার সঙ্গে একমত। তারা যে খরস্রোতা নদীর উপকূলের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে, তার একটা কারণ বোধহয় অ্যানাকোন্ডা দর্শনের প্রত্যাশা। এখনো পর্যন্ত সে-আশা পূরণ হবার কোনো লক্ষণ দেখছি না। মাইলখানেক যাবার পর আমাদের নৌকা থামাতে হল।

নদীর ধারে তিনজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে; তারা হাইটরের দিকে হাত তুলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে অচেনা ভাষায় কী যেন বলছে। আমি জানি এখানকার উপজাতিদের মধ্যে 'গে' নামে একটা ভাষা প্রচলিত আছে, যেটা হাইটর খুব ভালভাবেই জানে।

হাইটর লোকগুলোর সঙ্গে কথা বলে আমাদের তিনজনকে উদ্দেশ করে বলল, "এরা স্থানীয় ইন্ডিয়ান। এরা আমাদের পোরোরি যেতে বারণ করছে।"

"কেন?"—আমরা তিনজনেই প্রায় একসঙ্গে প্রশ্ন করলাম।

"এরা বলছে চুকাহামাইরা কী কারণে নাকি ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে রয়েছে। কালই নাকি একটা জাপানী দল পোরোরি গিয়েছিল; তাদের দু'জনকে এরা বিষাক্ত তীর দিয়ে মেরে ফেলেছে।"

আমি জানি কুরারি নামে এক সাঙ্ঘাতিক বিষ ব্রেজিলের আদিম জাতিরা তাদের তীরের ফলায় মাখিয়ে শিকার করে।

"তাহলে এখন কী করা যায়?" আমি প্রশ্ন করলাম।

হাইটর বলল, "আপাতত এখানেই ক্যাম্প ফেলা যাক। আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি বরং একটা ক্যানু নিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা আঁচ করে আসি।"

"কিন্তু এই হঠাৎ-উত্তেজনার কারণটা কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?" সন্ডার্স প্রশ্ন করল।

হাইটর বলল, "আমার একটা ধারণা হচ্ছে পরশু রাত্রের বিস্ফোরণের সঙ্গে এটা যুক্ত। বড় রকম একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলে এরা এখনো সেটাকে দেবতার অভিশাপ মনে করে বিচলিত হয়ে পড়ে।"

অগত্যা নামলাম আমরা ক্যানু থেকে।

জায়গাটা যে ক্যাম্প ফেলার পক্ষে আদর্শ নয় সেটা বেশ বুঝতে পেরেছি। এখানে সাধারণত নদীর পাশে খানিকটা দূর অবধি জঙ্গল গভীর থাকে। ভিতরে কিছুটা অগ্রসর হলে দেখা যায় বন পাতলা হয়ে এসেছে। এই জায়গাটায় কিন্তু যতদূর অবধি দৃষ্টি যায়, তাতে অরণ্যের ঘনত্ব হ্রাস পাবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।

নদীর দশ-পনেরো গজের মধ্যে একটা অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গা পেয়ে আমরা সেখানেই বিশ্রামের আয়োজন করলাম। কতক্ষণের অপেক্ষা জানা নেই, তাই তাঁবুও খাটিয়ে ফেলা হল—বিশেষ করে লোবোর জন্য। সে ভালর দিকে যাচ্ছে জেনেও মিনিটে-মিনিটে যীশু ও মেরি মাতাকে স্মরণ করছে। হয়তো সেটা এই কারণেই যে, সে অনুমান করছে আমরা শহরে ফিরে গিয়েই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করব। এ আশঙ্কা যদি সে সত্যিই করে থাকে, তবে সেটা ভুল নয়, কারণ আমি তাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত থাকলেও, ক্রোল ও সন্ডার্স দু'জনেই লোবোর গর্দান নিতে বদ্ধপরিকর। আর ব্লুমগার্টেনকে পেলে তারা নাকি তার মাংস সিদ্ধ করে ব্রেজিলের নরমাংসভুক উপজাতির সন্ধান করে তাদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে। তাদের বিশ্বাস ব্লুমগার্টেনের মাংসে অন্তত বারো জনের ভূরিভোজ হবে।

আমরা তিনজনেই বেশ ক্লান্ত। পর পর চারটি বড় গাছের গুঁড়িতে তিনটি হ্যামক টাঙিয়ে তিনজনে শুয়ে মৃদু দোল খাচ্ছি, কাছেই বনের ভিতর থেকে

মাঝে-মাঝে শুনতে পাচ্ছি চুরিয়াঙ্গি পাখির কর্কশ ডাক, এমন সময় সভার্স হঠাৎ একটা গোঙানির মতো শব্দ করে উঠল। আর সেই সঙ্গে আমাদের নৌকার দু'জন মাঝি একসঙ্গে তারস্বরে চিৎকার করে উঠল।

এই গোঙানি ও চিৎকারের কারণ যে একই, সেটা বুঝতে আমার ও ক্রোলের তিন সেকেন্ডের বেশি সময় লাগেনি।

আমাদের থেকে দশ-বারো গজ দূরে একটা দীর্ঘাকার গাছের উপর দিকের একটা ডাল বেয়ে যেন আমাদেরই লক্ষ করে নেমে আসছে একটা সাপ, যেমন সাপের বর্ণনা পুরাণ বা রূপকথার বাইরে কোথাও পড়েছি বলে মনে পড়ে না।

এ সাপের নাম জানি, হয়ত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে বিস্ময়ের তাড়নায় নামটা আপনা থেকেই মুখ থেকে বেরিয়ে আসত, কিন্তু এখন দেখলাম গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোনোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আতঙ্কের সঙ্গে একটা ঝিম-ধরা ভাব, যেটা পরে ক্রোল ও সভার্সকে জিগ্যেস করে জেনেছিলাম তাদেরও হয়েছিল।

ব্রেজিলের এই অতিকায় ময়াল মাটি থেকে প্রায় বিশ হাত উঁচু ডাল থেকে যখন মাটি-ছুঁই-ছুঁই অবস্থাতে পৌঁছেছে, তখনও তার আরো অর্ধেক নামতে বাকি। তার মানে এর দৈর্ঘ্য ষাট ফুটের কম নয়, আর প্রস্থ এমনই যে, মানুষ দু'হাতে বেড় পাবে না।

আমি এই অবস্থাতেও বুঝতে চেষ্টা করছি আমার মনের ভাবের মধ্যে কতটা বিস্ময় আর কতটা আতঙ্ক, এমন সময় পিছন দিক থেকে একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর পাবার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের তিনজনকে বেকুব বানিয়ে দিয়ে চোখের সামনে থেকে অ্যানাকোন্ডাপ্রবর বেমালুম উধাও।

"আপনাদের আশ মিটেছে তো ?"

আমাদের পিছনে কখন যে একটি ক্যানু এসে দাঁড়িয়েছে এবং কখন যে তার থেকে শ্রীমান নকুড়চন্দ্র অবতীর্ণ হয়েছেন, তা জানি না।

"আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই," এগিয়ে এসে পাশে দাঁড়ানো একটি সাহেবের দিকে নির্দেশ করে বললেন নকুড়বাবু,—"ইনি হলেন ব্লুমগার্টেন সাহেবের বিমানচালক মিস্টার জো হপগুড। ইনিই সাহেবের হেলিকপ্টারে করে আমাকে নিয়ে এলেন। শুধু শেষের দেড় মাইল পথ আমাদের ডিঙিতে আসতে হয়েছে।"

ক্রোল আর থাকতে না-পেরে বলে উঠল—"হি মেড আস সী দ্যাট স্নেক !"

আমি বললাম, "তোমাকে তো বলেইছিলাম ওনার মধ্যে এই ক্ষমতারও একটা আভাস পেয়েছিলাম দেশে থাকতেই।"

"বাট দিস ইজ ইনক্রেডিবল !"

নকুড়বাবু লজ্জায় লাল। বললেন, "তিলুবাবু, আপনি দয়া করে এঁদের বুঝিয়ে দিন যে, এতে আমার নিজের কৃতিত্ব কিছুই নেই। এসবই হল যিনি আমায় চালাচ্ছেন, তাঁরই খেলা।"

"কিন্তু এল ডোরাডো ?"

"সে তো দেখিয়ে দিয়েছি সাহেবকে হেলিকপ্টার থেকেই। যেমন সাপ দেখালুম, সেইভাবেই দেখিয়েছি। বরদা বাঁড়ুজ্যের বইয়েতে কিছু ছবি ছিল, মদন পালের আঁকা। সাপের ছবি, এল ডোরাডোর ছবি, সবই ছিল। বাজে ছবি মশাই। সোনার শহরের বাড়িগুলো দেখতে করেছে টোল-খাওয়া টোপরের মতো—তাও সিধে নয়, ট্যারচা। সাহেবও সেই ছবির মতো শহরই দেখলে, আর দেখে বললে, "এল ডোরাডো ইজ ব্রেথ-টেকিং।"

"তারপর ?"

আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছি নকুড়বাবুর কথা।

"তারপর আর কী ?—জঙ্গলের মধ্যে শহর। সেখানে হেলিকপ্টার নামবে কী করে ? নামলুম জঙ্গলের এদিকটায়। সাহেব দুই বন্দুকধারীকে নিয়ে ঢুকে পড়লেন, আর আমি চলে এলুম আমার কথামতো আপনাদের মীট করব বলে। আমি জানি আপনারা কী ভাবছেন—হপগুড সাহেব আমাকে আনতে রাজি হলেন কেন। এই তো ? ব্লুমগার্টেন সাহেবের সঙ্গে চুক্তি ছিল উনি এল ডোরাডো চাক্ষুষ দেখলেই আমার হাতে তুলে দেবেন নগদ পাঁচ হাজার ডলার। হপগুডকে বলে রেখেছিলুম, আড়াই দেব ওকে যদি ও আমাকে পৌঁছে দেয় আপনাদের কাছে। দেখুন কীরকম কথা রেখেছেন সাহেব—মনটা কীরকম দরাজ ভেবে দেখুন ! আর, ও হ্যাঁ—এল ডোরাডো দেখা গেলে ব্লুমগার্টেন সাহেব এটাও কথা দিয়েছিলেন যে, তিনি আপনার গবেষণার কাগজপত্তরের কপি ফেরত দেবেন। এই নিন সেই কাগজ।"

নকুড়বাবু তাঁর কোটের পকেট থেকে রাবার-ব্যান্ডে বাঁধা এক তাড়া কাগজ বার করে আমার হাতে তুলে দিলেন। আমি এত মুহ্যমান যে মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরোল না। এর পরের প্রশ্নটা ক্রোলই করল।

"কিন্তু ব্লুমগার্টেন যখন দেখবে এল ডোরাডো নেই, তখন কী হবে ?"

প্রশ্নটা শুনে নকুড়বাবুর অট্টহাসিতে আশেপাশের গাছ থেকে খান তিনেক ম্যাকাও উড়ে পালিয়ে গেল।

"ব্লুমগার্টেন কোথায় ?" কোনোমতে হাসি থামিয়ে বললেন নকুড় বিশ্বাস।—"তিনি কি আর ইহজগতে আছেন ? তিনি জঙ্গলে ঢোকেন বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। তার ছ' ঘণ্টা পরে, রাত এগারোটা তেত্রিশ মিনিটে, এল ডোরাডোয় উল্কাপাতের ফলে সাড়ে তিন মাইল জুড়ে একটি গোটা জঙ্গল

একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ-ঘটনাও যে আপনাদের আশীর্বাদে আগে থেকেই জানা ছিল, তিলুবাবু ! আপনার মতো এমন একজন লোক, যাঁর সঙ্গ পেয়ে আজ আমি তিন শো টাকা দামের একটি বিলিতি ওষুধ কিনে নিয়ে যেতে পারছি আমার ঠাকুমার জন্য, তাঁর শত্রুর কি আর শেষ রাখতে পারি আমি ?"

ব্রাসিলিয়ায় এসেই দেখেছি খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার অর্ধেকটা জুড়ে রয়েছে কুইয়াবা—সান্তেরাম হাইওয়ের ত্রিশ কিলোমিটার পশ্চিমে একটি গভীর অরণ্যে আনুমানিক কুড়ি লক্ষ টন ওজনের একটি উল্কাপাতের খবর। সৌভাগ্যক্রমে এই অঞ্চলে কোনো মানুষের বাস ছিল না। জীবজন্তু গাছপালা ইত্যাদি যা ছিল তা সবই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

মরুরহস্য

১০ই জানুয়ারি

নতুন বছরের প্রথম মাসেই একটা দুঃসংবাদ। ডিমেট্রিয়াস উধাও ! প্রোফেসর হেক্টর ডিমেট্রিয়াস, বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ। ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপের রাজধানী ইরাক্লিয়ন শহরের অধিবাসী ছিলেন ডিমেট্রিয়াস। আমার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ছিল না, তবে পত্রালাপ হয়েছে বছর তিনেক আগে। ভদ্রলোক প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করছেন জানতে পেরে আমি আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের কিছু খবর দিয়ে তাঁকে চিঠি লিখি। তিনি পাওয়ামাত্র ধন্যবাদ জানিয়ে উত্তর দেন। মুক্তোর মতো ইংরিজি হাতের লেখা, ভাষার উপরেও আশ্চর্য দখল। পরে আমার বন্ধু প্রোফেসর সামারভিলের কাছে জানতে পারি ডিমেট্রিয়াস নাকি কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। কাল সামারভিলের চিঠিতেই ভদ্রলোকের নিরুদ্দেশের খবরটা পাই। চিঠি থেকে যা জানা গেল তা মোটামুটি এই—

গত ৪ঠা জানুয়ারি সকাল আটটার সময় প্রোফেসর ডিমেট্রিয়াস একটা সুটকেস হাতে নিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যান। তাঁর চাকর তাঁকে বেরোতে দেখেছিল, কিন্তু মনিব কোথায় যাচ্ছেন সে খবর তার জানা ছিল না। সন্ধ্যা পর্যন্ত ভদ্রলোক বাড়ি না ফেরায় চাকর পুলিশে খবর দেয়। তদন্তে জানা যায় প্রোঃ ডিমেট্রিয়াস নাকি একটা ট্যাক্সি করে ইরাক্লিয়ন বিমান বন্দরে যান। সেখান থেকে সকাল সাড়ে দশটার সময় তিনি একটা প্লেন ধরেন। সে প্লেন যায় কায়রোতে। কায়রোতে খবর করে জানা যায় তিনি নাকি আলহাম্‌ব্রা হোটেলে উঠেছিলেন, এবং মাত্র একরাত সেখানে থাকেন। তারপর থেকে তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

চিঠিটা সামারভিল লিখেছে ইরাক্লিয়ন থেকে। ডিমেট্রিয়াসের বন্ধু ছিল সামারভিল। এথেন্সে একটা বক্তৃতা দিতে এসেছিল। এমনিতেই মতলব ছিল

বক্তৃতার পর একবার ক্রীটে ঘুরে যাবে। এথেন্‌সে থাকতে থাকতেই সংবাদপত্রে ডিমেট্রিয়াসের অন্তর্ধানের খবর পেয়ে অন্য কাজ ফেলে সোজা ইরাক্লিয়নে চলে যায়। এখন ও নিজেই তদন্ত চালাবে বলে স্থির করেছে। ওকে সাহায্য করবার জন্য আমায় ডাকছে। গ্রীসে গেছি এর আগে দুবার, কিন্তু ক্রীটটা যাওয়া হয়নি। মনটা উড়ু উড়ু করছে, হাতে বিশেষ কাজও নেই, তাই ভাবছি ঘুরে আসি।

১৪ই জানুয়ারি

আজ সকালে ইরাক্লিয়ন এসে পৌঁছেছি। শহর থেকে তিন মাইল দূরে সাইলোরিটি পাহাড়ের ঠিক পায়ের কাছে ডিমেট্রিয়াসের বাড়ি। চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ; কিন্তু সেটা উপভোগ করার সময় এটা নয়। সামারভিল বেশ চিন্তিত, এবং তার চিন্তার কারণও আছে যথেষ্ট। প্রথমত, কায়রোতে অনুসন্ধান করেও আর কোনো খবর আসেনি। দ্বিতীয়ত, ডিমেট্রিয়াসের এভাবে না বলে ক'য়ে চলে যাবার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর ল্যাবরেটরিতে জিনিসপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেও ইদানীং তিনি কী বিষয়ে গবেষণা করছিলেন তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। তাঁর একটা সবুজ রঙের খাতা পাওয়া গেছে যেটা মনে হয় তিনি সম্প্রতি ব্যবহার করেছিলেন। তাতে লেখা আছে বিস্তর, কিন্তু সে লেখার জন্য এমন এক উদ্ভট ভাষা ও উদ্ভট অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে, যার কূলকিনারা করা সম্ভব হয়নি। আমি নিজেও সে খাতাটা দেখেছি এবং তার লেখা পড়ার চেষ্টা করেছি। একেকটা অক্ষর হঠাৎ দেখে ইংরিজি বলে মনে হয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারিনি। ভাষাটা সাংঘাতিক হতে পারে কিনা জিগ্যেস করাতে সামারভিল বলল, 'কিছুই আশ্চর্য নয়। ওর ভাষা সম্পর্কে একটা বিশেষ কৌতূহল ছিল। "লিনিয়ার-এ"-র ব্যাপারটা তুমি জান কি ?'

আমি জানতাম খ্রিস্টপূর্ব দু'হাজার শতাব্দীতে ক্রীট দেশে যে ভাষা পাথরে খোদাই করে লেখা হত, তার নাম আজকের প্রত্নতাত্ত্বিকরা দিয়েছেন লিনিয়ার-এ। সামারভিল বলল এই ভাষা নিয়ে ডিমেট্রিয়াস নাকি বেশ কিছুদিন থেকে চর্চা করছেন। হয়ত এই খাতায় প্রাচীন শিলালিপি থেকে পাওয়া কোনো মূল্যবান তথ্যের বর্ণনা রয়েছে। ডিমেট্রিয়াসের চাকর মিখাইলি বলছিল যে তার মনিব নাকি সম্প্রতি প্রায়ই ইরাক্লিয়ন ছেড়ে ক্রীটের অন্যান্য প্রাচীন শহরে চলে যেতেন, এবং সেখানে পাঁচ সাতদিন করে থেকে পাথরের টুক্‌রো ইত্যাদি সংগ্রহ করে বাড়ি ফিরতেন। এইসব পাথরের টুকরো অনেকগুলিই অবশ্য বৈঠকখানায় ও ল্যাবরেটরিতে আমরা দেখেছি।

মিখাইলির আরেকটা কথাতেও সামারভিল বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। যেদিন ডিমেট্রিয়াস চলে যান, তার আগের দিনই নাকি সন্ধ্যাবেলা মিখাইলি একটা

বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পায়। সেটা আসে পিছনে পাহাড়ের দিক থেকে। ডিমেট্রিয়াস তখন বাড়ি ছিলেন না, কিন্তু ফিরে আসেন তার ঠিক দশ মিনিট পরেই। ডিমেট্রিয়াসের নিজের একটা বন্দুক ছিল, যদিও সেটা বহুকাল ব্যবহার হয়নি। সে বন্দুক নাকি এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না।

মিখাইলির একটা ছেলে আছে, বছর দশেক বয়স। ভারী চালাকচতুর। তার কথা বিশ্বাসযোগ্য কিনা জানি না, কিন্তু সে বলে যে যেদিন সন্ধ্যায় বন্দুকের আওয়াজ শোনা যায়, সেদিন নাকি সে দুপুর বেলা জঙ্গলের দিক থেকে বাঘের গর্জন শুনেছিল। আমি জানি ক্রীট দ্বীপে কস্মিন্ কালেও বাঘ থাকা সম্ভব নয়, সুতরাং এ ছোক্‌রা গর্জন শুনে চিনল কী করে ? জিগ্যেস করাতে ছেলেটি একগাল হেসে বলল যে ইরাক্লিয়নে সার্কাস এসেছিল, সেই সার্কাসে সে নাকি বাঘের গর্জন শুনেছে। কথাটা মিথ্যে বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। মোটকথা সব মিলিয়ে বেশ গোলমেলে ব্যাপার।

আমরা ঠিক করেছি দুপুরের খাওয়া সেরে একবার পাহাড়ের দিকটা ঘুরে আসব। ঘরের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি ওদিকটায় ঘন ঝাউবন। যদি কিছু ঘটে থাকে তো ওই বনের মধ্যেই ঘটেছে।

১৫ই জানুয়ারি

ইরাক্লিয়ন এয়ারপোর্টের রেস্টুর‍্যান্টে বসে ডায়রি লিখছি। কায়রোর প্লেন ছাড়তে নাকি ঘণ্টাখানেক লেট হবে, তাই এই ফাঁকে কালকের অদ্ভুত ঘটনাটা লিখে রাখি।

কাল লাঞ্চ সেরে প্রায় দুটো নাগাদ আমি আর সামারভিল পাহাড়ের গায়ে ঝাউবনের ভিতরটা একটু এক্সপ্লোর করতে বেরোলাম। বাড়ির পিছনে একটা পাতিলেবুর বাগান, সেটা পেরিয়েই পাহাড়ের চড়াই শুরু হয়।

ঝাউবনের ভিতর দিয়ে মিনিট দশেক হাঁটার পর, চোখে কিছু না দেখতে পেলেও, নাকে যেন একটা চেনা গন্ধ পাচ্ছি বলে মনে হল। সামারভিলের সর্দি হয়েছে, এতদূর থেকে সে গন্ধ পাবে না জানি, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম যে একশো গজের মধ্যে নিশ্চয়ই একটা মরা জানোয়ার-টানোয়ার কিছু পড়ে আছে। আমি গন্ধের দিকে এগোতে লাগলাম, সামারভিল আমার পিছনে। ক্রমে সামারভিলের নাকেও গন্ধটা প্রবেশ করল। সে ফিস্ ফিস্ করে আমায় জিগ্যেস করল, 'তুমি কি সশস্ত্র ?' আমি কোটের বুকপকেট থেকে আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা বার করে তাকে দেখিয়ে দিলাম। মৃত জানোয়ারের আশেপাশে কোনো জ্যান্ত জানোয়ার লুকিয়ে থাকতে পারে এটাই বোধহয় আশঙ্কা করছিল সামারভিল।

আমরা অতি সন্তর্পণে চারিদিকে চোখ রেখে এগোতে লাগলাম।

সামারভিলের দৃষ্টিই প্রথম গেলো শকুনিগুলোর দিকে। ঝাউবনের মাঝখানে একটা অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় আট দশটা শকুনি মিলে একটা কালো মরা জানোয়ারের মাংস খাচ্ছে। ব্যাপারটা ঘটছে অন্তত ত্রিশ হাত দূরে—কাজেই জানোয়ারটা যে কী সেটা এখনো বুঝতে পারছি না। আরো কয়েক পা এগোতেই আমার চোখ হঠাৎ চলে গেলো মাটির দিকে। আমাদের পায়ের ঠিক সামনে সাদা বুনো ফুলের একটা ঝোপের পাশেই পড়ে আছে এক চাবড়া কুচকুচে কালো লোম।

'ভাল্লুক ?'

প্রশ্নটা আপনা থেকেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'মোস্ট আনলাইক্লি', সামারভিল মন্তব্য করল। আমিও জানি এ-তল্লাটে ভাল্লুক থাকার কোনো সম্ভাবনা নেই।

সামারভিল ইতিমধ্যে এক গোছা কালো লোম হাতে তুলে নিয়েছে। লক্ষ করলাম লোমগুলো প্রায় এক বিঘত লম্বা এবং অস্বাভাবিক রকম রুক্ষ।

আরো দশ পা এগোতেই জানোয়ারের মাথার দিকটা চোখে পড়ল। যদিও মাথার খানিকটা অংশ শকুনিরা খুবলে খেয়ে নিয়েছে, তবু সেটা যে ব্যাঘ্র শ্রেণীর কোনো জানোয়ার সেটা বুঝতে অসুবিধা হল না।

আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে একটা শকুনি ডানা ঝটপটিয়ে লাফিয়ে এক পাশে সরে যাওয়াতে জানোয়ারের শরীরের আরো খানিকটা অংশ দেখা গেল। পাঁজরার হাড়, ও তারই আশেপাশে লেগে থাকা মাংস আর ঘন কালো লোমে ঢাকা চামড়া। শকুনিগুলো দিব্যি ভোজ মেরে চলেছে। ক্রীট দ্বীপে প্যান্থার বা ওই জাতীয় কোনো জানোয়ারের মাংস কি এরা কোনোদিন খেয়েছে ? মনেতো হয় না। প্যান্থার কথাটা যদিও ব্যবহার করছি, কিন্তু আমি জানি যে কস্মিন্‌কালেও কোনো প্যান্থারের লোম এত বড় বা এত রুক্ষ হয় না।

সামারভিলও অগত্যা বলল, 'ব্যাঘ্র শ্রেণীর একটি আনকোরা নতুন জানোয়ার—এছাড়া আর কিছু বলা যায় না একে।'

'কিন্তু এটাকেই কি বন্দুক দিয়ে মারা হয়েছিল ?'

'তাইতো মনে হয় ; তবে ডিমেট্রিয়াস মেরেছিলেন কিনা সেটাই প্রশ্ন।'

বাড়ি ফিরে এসে মিখাইলিকে জন্তুটার কথা বলতে সে অবাক হয়ে গেল। 'কালো জন্তু ? বাঘের মতো দেখতে ? এক কালো বেড়াল আর কালো কুকুর ছাড়া আর কোনো কালো জন্তু এদিকটায় কখনো দেখেছি বলেতো মনে পড়ে না।'

সন্ধ্যাবেলা ডিমেট্রিয়াসের শোবার ঘরের রাইটিং ডেস্ক থেকে একটা মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেল। সেটা হল একটা ডায়রি। চামড়ায় বাঁধানো ঝকঝকে নতুন

ডায়রি, তাতে জানুয়ারি মাসের ২রা এবং ৩রা তারিখের পাতায় ডিমেট্রিয়াসের হাতে গ্রীক ভাষায় লেখা দুটো মন্তব্য রয়েছে। আমরা দুজনে মিলে সে দুটোর মানে করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। সামান্য হলেও, সে লেখা যেমন রহস্যময় তেমনিই কৌতূহলোদ্দীপক। ২রা জানুয়ারির লেখাটা বাংলা করলে এই দাঁড়ায়—

'আমার জীবনে সব সময়ই দেখেছি যে আনন্দের কারণ এবং উদ্বেগের কারণ একই সঙ্গে পাশাপাশি ঘোরাফেরা করে। তাই সাফল্যেও শান্তি নেই। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে আর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় হাত দেব না। যাই হোক্, আমার এই ভুলের মাশুল আমাকেই দিতে হবে। বাবার বন্দুকটা বার করতে হবে। সেই ছেলেবেলায় এয়ারগান ছুঁড়েছি, ভালো টিপ ছিল। এখনো আছে কি ?'

'বাবার বন্দুক' সম্বন্ধে সামারভিলকে জিগ্যেস করতে ও বলল ডিমেট্রিয়াসের বাবা নাকি বিখ্যাত শিকারী ও পর্যটক ছিলেন, এবং আফ্রিকার জঙ্গলে নাকি বিস্তর ঘোরাফেরা করেছেন। এখন বুঝতে পারছি বৈঠকখানার মেঝেতে পাতা সিংহের ছালটা কোত্থেকে এসেছে। ৩রা জানুয়ারির পাতায় লেখা—

'ক্নোসস্ শহরের সেই মেলায় আজ থেকে দশ বছর আগে এক বেদে বুড়ি আমার ভবিষ্যৎ বলেছিল। তার মতে আমার পঁয়ষট্টি বছরের জন্মতিথিতে নাকি একটা মস্ত বড় ফাঁড়া আছে, সেটা নাকি কাটানো মুশকিল হবে। পঁয়ষট্টি হতে আর মাত্র ১৬ দিন বাকি। অর্থাৎ ১৯শে জানুয়ারি। বুড়ির অন্য ভবিষ্যদ্বাণীগুলো সবই ফলেছে, তাই এটাও ফলবে বলে মেনে নিতে পারি। হয়ত আমি যে পরীক্ষাটা করতে যাচ্ছি তাতেই আমার মৃত্যু হবে। হয় হোক্। যদি মরার আগে পরীক্ষায় সফল হতে পারি তাহলে মরতে কোনো আপসোস নেই। কিন্তু এই জনবহুল ক্ষুদ্রায়তন ক্রীট দ্বীপ আমার পরীক্ষার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত জায়গা নয়। আমার চাই বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর। আমার চাই—সাহারা !'

'সাহারা' কথাটার তলায় দুবার মোটা করে লাইন টানা আছে। কায়রো যাবার কারণটা এ থেকে পরিষ্কার হচ্ছে ; কিন্তু পরীক্ষাটা যে কী এবং তার জন্য মরুভূমির কেন প্রয়োজন সে বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। দেখি কায়রোয় গিয়ে যদি কিছুটা আলোর সন্ধান পাওয়া যায়।

১৫ই জানুয়ারি বিকেল ৫টা

কায়রো। আমরা দুজনে আল্‌হাম্‌ব্রা হোটেলেই উঠেছি। হোটেলের খাতায় নাম লেখার সময় ডিমেট্রিয়াসের নামটাও চোখে পড়ল। ৪ঠা জানুয়ারি সে যে সত্যিই এই হোটেলে এসে উঠেছিল তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গেল। নামটা দেখেই সামারভিল একটা পাকা গোয়েন্দার মতো কাজ করে ফেলল ; ডিমেট্রিয়াস

যে ঘরে ছিলেন—অর্থাৎ ৩১৩ নম্বর ঘর—সেই ঘরটাই আমাদের থাকার জন্য চেয়ে বসল। সৌভাগ্যক্রমে ঘরটা খালিই ছিল, কাজেই পেতে অসুবিধা হল না। সে-ঘরে ডিমেট্রিয়াসের কোনো চিহ্ন পাওয়া যাবে এটা আশা করা বৃথা, কারণ গত এগারো দিনে অনেকেই সে ঘরে থেকে গেছে এবং অনেকবারই সে-ঘর ঝাড়পোঁছ হয়েছে। কিন্তু তাও দেখলাম যে শেষ পর্যন্ত লাভই হল। এ ঘরের যে রুম-বয়—অর্থাৎ যে ছোক্‌রাটি কিছুক্ষণ আগে আমাদের বিছানাপত্র গোছগাছ করে দিয়ে গেল—তার সঙ্গে কথা বলে কিছু তথ্য সংগ্রহ হয়েছে। সামারভিলই প্রথম প্রশ্ন করল ছেলেটিকে।

'কদ্দিন কাজ করছ এ-হোটেলে?'

'চার বছর।'

'এ ঘরে যারা এসে দু'একদিন থেকে চলে যায় তাদের কথা মনে থাকে তোমার?'

'যারা যাবার সময় ভালো বকশিশ দেয় তাদের কথা মনে থাকে বৈ কি।'

বুঝলাম ছোকরা বেশ রসিক। সামারভিল বলল, 'দিন দশেক আগে একজন গ্রীক ভদ্রলোক এ ঘরে এসে এক রাত ছিলেন। বৈজ্ঞানিক। সঙ্গে একটা কালো সুটকেস। পাঁচ ফুটের বেশি হাইট নয় ভদ্রলোকের। বছর পঁয়ষট্টি বয়স, মাথায় টাক, যেটুকু চুল আছে কাঁচা, ঘন কালো ভুরু, টিকোলো নাক—মনে পড়ছে?'

ডিমেট্রিয়াসকে যদিও দেখিনি, ইরাক্লিয়নে তাঁর বাড়ির বৈঠকখানায় ম্যান্টলপিসে তাঁর একটা বাঁধানো ফোটো দেখে তাঁর চেহারাটার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।

রুম-বয় হেসে বলল, 'পঁচাত্তর পিয়াস্ত্র্ বকশিশ দিয়ে গেলেন, থাকবে না মনে?'

পঁচাত্তর পিয়াস্ত্র্ মানে পনেরো টাকা। রুম-বয়ের খুশি হবারই কথা।

'ভদ্রলোক তো মাত্র একরাত ছিলেন, তাই না?' সামারভিল জিগ্যেস করল।

'হ্যাঁ; আর তার মধ্যেও বেশির ভাগ সময়ই তাঁর দরজার বাইরে 'ডু নট ডিস্টার্ব' নোটিশ টাঙানো থাকত।'

'এখান থেকে উনি কোথায় যাবেন সেটা কিছু বলেছিলেন কি?'

'আমাকে উটের কথা জিগ্যেস করেছিলেন। বললেন উটের পিঠে চড়ে মরুভূমিতে যাবেন, উট কোথায় ভাড়া পাওয়া যায়। আমি বললাম, এল্ গিজা থেকে ক্যারাভ্যানের রাস্তা আছে—হাজার মাইল চলে গেছে মরুভূমির মধ্য দিয়ে। এল্ গিজায় গেলে উট ভাড়া পাওয়া যাবে।'

রুম-বয়ের কাছ থেকে এর বেশি কিছু জানা যায়নি। তবে গিজার খবরটা

জরুরী। নাইল নদীর পূর্ব দিকে কায়রো শহর, আর ব্রিজ পেরিয়ে পশ্চিমে হল গিজা—বিখ্যাত পিরামিড ও স্ফিঙ্ক্সের জায়গা। গিজা আমার আগেই দেখা ছিল, যদিও ক্যারাভ্যানের রাস্তা ধরে উটের পিঠে চড়ে মরু অভিযানের অভিজ্ঞতা আমার নেই। আজকের দিনটা কায়রো শহরে ডিমেট্রিয়াস সম্বন্ধে আরেকটু খোঁজখবর করে কাল সকালে গিজায় যাবো স্থির করলাম।

১৬ই জানুয়ারি, দুপুর সাড়ে বারোটা

প্রায় পাঁচশো উটের একটা ক্যারাভ্যানের সঙ্গে আমরা চলেছি মরুপথ দিয়ে বাহারিয়া ওয়েসিসের রাস্তায়। যাত্রীদের সকলেই প্রায় ব্যবসাদার—শহরে তৈরি পশমের জামাকাপড় ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে এরা বাণিজ্য করতে চলেছে গভীর মরুদেশের গ্রামাঞ্চলে। এই সব জিনিসের বদলে ওরা নিয়ে আসবে প্রধানত খেজুর। এই বাণিজ্য চলে আসছে একেবারে আদ্যিকাল থেকে।

দশ মিনিট হল আমরা একটা মরূদ্যান বা ওয়েসিসের ধারে থেমেছি বিশ্রামের জন্য। এ অঞ্চলটা একটা উপত্যকা। দিগন্ত বিস্তৃত বালির ফাঁকে ফাঁকে চুনা পাথরের টিলা মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। আমাদের কাছেই একটা জলাশয়, আর সেটাকে ঘিরে কয়েকটা খেজুর গাছ আর বেদুইনদের তাঁবু। এছাড়া রয়েছে মিশরের প্রাচীন সভ্যতার কিছু নমুনা। জলাশয়ের ওপারে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা বোধহয় একটা মন্দিরের ভগ্নস্তূপ। আমার পাশেই রয়েছে একটা মাথাভাঙা থাম, সেটার ছায়ায় বসে আমি ডায়রি লিখছি।

আমরা হোটেল থেকে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়েছি সকাল সাড়ে সাতটায়। গিজা পৌঁছতে লাগল আধ ঘন্টা। যেখানে উট ভাড়া করলাম, তার কাছেই রাস্তার ধারে এক সারি দোকান, তার মধ্যে এক বৃদ্ধ খেজুর বিক্রেতার কাছে ডিমেট্রিয়াসের খবর পাওয়া গেল। আমি আরবী ভাষা জানি, তাই একে ওকে ডিমেট্রিয়াসের বর্ণনা দিয়ে তাঁকে দেখেছে কিনা জিগ্যেস করছিলাম। তাদের মধ্যে একজন ওই বুড়ো ফলওয়ালাকে দেখিয়ে বলল, 'ওকে জিগ্যেস করে দেখুন, ও জানতে পারে।' খেজুরওয়ালাকে প্রশ্ন করতেই সে হাত নেড়ে চোখ রাঙিয়ে অকথ্য ভাষায় ডিমেট্রিয়াসকে উদ্দেশ করে গাল পাড়তে লাগল। কী ব্যাপার জিগ্যেস করাতে শেষটায় সে বলল, ডিমেট্রিয়াস তার কাছ থেকে খেজুর কিনে যে পয়সা দিয়েছিল, তার মধ্যে নাকি দুটো গ্রীক লেপ্‌টা ছিল। বুড়ো চোখে ভালো দেখে না তাই বুঝতে পারেনি। পরে জানতে পেরে খোঁজ করে দেখে সাহেব উধাও। শেষ পর্যন্ত তার বাক্যস্রোত বন্ধ করার জন্য সামারভিল তাকে স্থানীয় পয়সা দিয়ে তার ক্ষতি পূরণ করল। বুঝতে পারছি গিজায় এসে ভুল করিনি। ডিমেট্রিয়াস এখান থেকেই উট নিয়ে মরুভূমির উদ্দেশে যাত্রা করেছে। কিন্তু সে

কি যাত্রীদলের সঙ্গেই গেছে, না মাঝপথে মোড় ঘুরে নিজের খেয়াল মতো রাস্তা নিয়েছে ?

আমি সঙ্গে করে আমার ক্ষিদে মেটানো বড়ি—বটিকা ইণ্ডিকা—নিয়েছি পনেরো দিনের মতো। আশা করি তার মধ্যেই আমাদের কাজের শেষ হয়ে যাবে, এবং আশা করি ডিমেট্রিয়াসকে আমরা জীবিত অবস্থাতেই পাব। বেদেবুড়ির কথাটা জেনে অবধি মনটা খচ্ খচ্ করছে। এ ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী অনেক সময় ফলে যায় সেটা আমিও দেখেছি, যদিও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি দিয়ে এর কারণ এখনো স্থির করতে পারিনি। ১৯শে জানুয়ারি ডিমেট্রিয়াসের জন্মতিথি। আর ওই একই দিন ওর ফাঁড়া। আজ হল ১৬ই···

১৭ই জানুয়ারি, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা

আমার থারমোমিটার বলছে কন্‌কনে শীত—অর্থাৎ একত্রিশ ডিগ্রী ফারেনহাইট—কিন্তু এয়ার কণ্ডিশনিং পিল ব্যবহার করার জন্য আমরা দুজনেই সাধারণ সুতোর পোশাকে চালিয়ে নিতে পারছি।

কতখানি পথ এসেছি এই ছত্রিশ ঘণ্টায় জানি না। আন্দাজে মনে হয় শ'খানেক মাইল হবে। আজকের মতো আমাদের যাত্রা শেষ হয়েছে। রাতটা বিশ্রাম করে কাল সকালে আবার রওনা দেব। মরুযাত্রীর দল ধুনি জ্বালিয়ে তাঁবু ফেলে বসেছে। উটগুলো ঘাড় উঁচু করে গম্ভীর ভাবে জাবর কাটছে, আর মাঝে মাঝে হ্রেষাধ্বনির মতো বিকট শব্দ করছে। শেয়ালের ডাকও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। এবার মনে হল একটা হাইনার হাসি শুনলাম। পথে আসার সময় ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে খরগোশ আর একরকম ধাড়ি ইঁদুর মাঝে মাঝে বেরোতে দেখা যায়। সাপ এখনো চোখে পড়েনি। দিনের আকাশে বাজ আর চিল উড়তে দেখেছি। এছাড়া আর কোনো পাখি নজরে পড়েনি।

আমাদের তাঁবু আমরা সঙ্গেই এনেছি। আপাতত তার ভিতরে বসে আমরা দুজনে আমারই তৈরি লুমিনিম্যাক্স আলোর সাহায্যে কাজ করছি। ন্যাফথালিনের বলের মতো দেখতে এই আলোয় দেশলাই সংযোগ করলেই প্রায় দুশো ওয়াট পাওয়ারের আলো বেরোয়। একটা বলে একরাতের কাজ চলে। সঙ্গে স্টক্ আছে যথেষ্ট।

আজ বিকেল চারটে নাগাদ পথে যে ঘটনাটা ঘটল এবার সেটার কথা বলি।

আজ সারা দুপুরই আবহাওয়াটা বেশ গুমোট ছিল—যদিও গরম নয় মোটেই। গুমোট ভাব দেখে, এবং পশ্চিমের আকাশে খানিকটা মেঘ জমেছে দেখে, আমি তো ভাবছিলাম হয়ত বা বৃষ্টি হবে, কারণ এখানে বছরে যে তিন চারদিন বৃষ্টি হয়, সেটা শীতকালে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৃষ্টি হল না। তার বদলে যে দিকে মেঘ

জমেছিল সেদিক থেকে একটা হাওয়া দিতে শুরু করল, আর সেই হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কানে একটা শব্দ ভেসে এল। শব্দটা এই মরুভূমির পরিবেশে যেমনি অদ্ভুত তেমনি অপ্রত্যাশিত। দুম্—ধুপ্···দুম্—ধুপ্···দুম্—ধুপ্···। যেন কোথাও একটা অতিকায় দামামার তালে তালে ঘা পড়ছে! শব্দটা এতই গম্ভীর যে তেমন আওয়াজ বার করতে হলে দামামার আয়তন হওয়া উচিত অন্তত একখানা পিরামিডের সমান।

কিছুক্ষণ চলার পরেই বুঝলাম যে শব্দটা শুধু আমার কানেই পৌঁছায়নি ; যাত্রীদের অনেকেই সেটা শুনেছে, এবং তার ফলে তাদের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শুধু মানুষ নয়—উটের মধ্যেও যেন একটা সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ করলাম। গোটা দশেক উট তো যাত্রী-সমেত ল্যাগব্যাগ করে বালির উপর বসেই পড়ল। এদিকে বাতাস বয়ে চলেছে, আর তার সঙ্গে শব্দও হয়ে চলেছে—দুম্—ধুপ্···দুম্—ধুপ্···দুম্—ধুপ্···। হিসেব করে দেখলাম যে প্রথম দুটো আঘাতের মাঝখানে তিন সেকেণ্ডের তফাত, আর তার পর পাঁচ সেকেণ্ডের একটা ফাঁক। এই ভাবেই, এই ছন্দেই, ক্রমাগত হয়ে চলেছে শব্দটা।

আমরা দুজনেই উটের পিঠ থেকে নেমে পড়লাম। সামারভিলকে বললাম, 'কী বুঝছ ?' সামারভিল কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে বলল, 'আওয়াজটা মনে হয় মাটির তলা থেকে আসছে।' আমারও সেই রকমই মনে হচ্ছিল। শব্দটায় তেজ আছে, গাম্ভীর্য আছে, কিন্তু স্পষ্টতার অভাব। সেটা যে কতদূর থেকে আসছে তাও বোঝার কোনো উপায় নেই। এদিকে যাত্রীদের মধ্যে বেজায় সোরগোল পড়ে গেছে। একটি বুড়ো পশমওয়ালা—তার গায়ের রং তামাটে আর মুখে অসংখ্য বলিরেখা—আমার কাছে এসে দানব দৈত্যের কথা বলতে লাগল ; একেবারে খাস আরব্যোপন্যাসের কাহিনী। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সে আমাদেরই দুজনকে অপয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় একটা বিশ্রী প্রপাগাণ্ডা শুরু করে দিল। প্রায় সাত আটশো লোক, হঠাৎ যদি তাদের মাথায় ঢোকে যে আমরা দুজন তাদের যাত্রাপথে অমঙ্গলের সূচনা করছি, তাহলে আর রক্ষা নেই।

এদিকে আমি বুঝতে পারছিলাম যে হাওয়াটা কমে আসছে, এবং সেই সঙ্গে শব্দটাও ক্ষীণ হয়ে আসছে। তৎক্ষণাৎ স্থির করলাম যে এই সুবর্ণ সুযোগটা হাতছাড়া করা চলবে না। শব্দের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে, নানা অঙ্গভঙ্গি করে তারস্বরে একটার পর একটা সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক আওড়াতে শুরু করলাম। পাঁচ নম্বর শ্লোকের মাঝামাঝি এসে হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে শব্দটাও। বলা বাহুল্য, এর পর যাত্রীদের মধ্যে কেউ আর আমাদের পিছনে লাগতে আসেনি।

কিন্তু এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে শব্দটা আমাদের দুজনকেও ভারী

অবাক করে দিয়েছে। অবিশ্যি এটার সঙ্গে ডিমেট্রিয়াসের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। সামারভিলের ধারণা ওটা বেদুইন বা ওই জাতীয় কোনো স্থানীয় আদিবাসীর ঢাক বা ড্রামের শব্দ—মরুভূমির খামখেয়ালি আবহাওয়ায় ম্যাগ্‌নিফাইড হয়ে একটা অস্বাভাবিক গুরুগম্ভীর চেহারা নিয়েছিল। হবেও বা। ওটা নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই, কারণ ও-শব্দ আর শোনা যাবে বলে মনে হয় না।

১৮ই জানুয়ারি, সকাল সাড়ে দশটা

আমাদের দুজনকে বাধ্য হয়ে দলচ্যুত হতে হয়েছে। অর্থাৎ ক্যারাভ্যান চলে গেছে দক্ষিণ-পশ্চিমে বাহারিয়া ওয়েসিসের বাঁধা রাস্তায়, আর আমরা চলে এসেছি পথ ছেড়ে উত্তর দিকে। কেন এমন হল সেটা বলি।

আজ ভোর ছ'টা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত একটানা চলার পর হঠাৎ লক্ষ করলাম রাস্তার ডান দিকে প্রায় দুশো গজ দূরে একটা বালির ঢিবির উপর এক পাল শকুনি। দেখেই কেন জানি বুকের ভিতরটা ছাঁত করে উঠল। পিছন ফিরে সামারভিলের দিকে চেয়ে দেখি তারও দৃষ্টি ওই শকুনিরই দিকে। ক্যারাভ্যান চলেছে সেটার পাশ কাটিয়ে, অথচ একটা অদম্য কৌতূহল হচ্ছে এগিয়ে গিয়ে দেখি শকুনিগুলো কিসের মাংস খেতে এত ব্যস্ত। আমার সঙ্গে যে উটওয়ালাটা ছিল তাকে মতলবটা জানালাম। বললাম, দল ছেড়ে শকুনিগুলোর দিকে যাবো, তারপর আবার ফিরে এসে দলে যোগ দেব ; তাতে তোমার আপত্তি আছে কি ?

লোকটা এক কথায় রাজী হয়ে গেল। বুঝলাম, আমার গতকালের অভিনয়ে কাজ দিয়েছে, এরা আমাকে একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সিদ্ধপুরুষ বলে ঠাউরে নিয়েছে। সামারভিল ও আমি উট ও উটওয়ালা সমেত দল ছেড়ে ডানদিকে ঘুরলাম।

মিনিট পাঁচেক পরে ঢিবির কাছে পৌঁছে আমাদের কৌতূহল মিটল। শকুনিরা যেটাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে সেটা হল উটের মস্তদেহ।

কিন্তু শুধু তাই কি ? তার পাশেই যে আরেকটা লাশ পড়ে আছে সেটাতো জানোয়ারের নয়, সেটা মানুষের। আমাদের সঙ্গে যে লোকদুটো রয়েছে, এও তাদেরই মতো একজন উটওয়ালা। বোঝাই যাচ্ছে যে উট সমেত এই উটওয়ালা আরেকটি ক্যারাভ্যান থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে এসে এখানে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। আপনা থেকেই মরেছে কি ? নাকি কেউ তাদের হত্যা করেছে ?

শকুনির দল থেকে দশ হাত দূরে বালির উপর ওটা কী পড়ে আছে ?

উট থেকে নেমে হেঁটে একটু এগিয়ে যেতেই প্রশ্নের উত্তর পেলাম। দুপুরের রোদে যেটা চক্‌চক্ করছিল সেটা একটা বন্দুকের নল ; বাঁটের দিকটা বালির

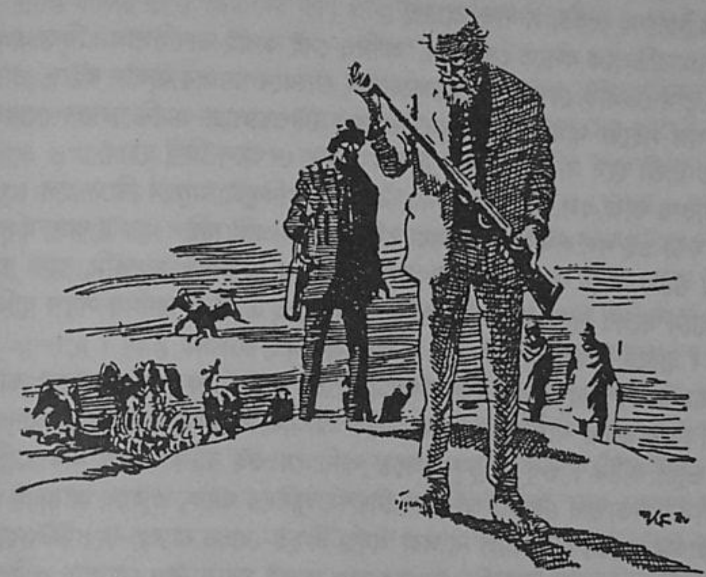

নিচে। বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে দেখি সেটা একটা জার্মান মাউজার রাইফ্‌ল। এই রাইফ্‌লের গুলিতেই যে এ দুটি প্রাণীর জীবনাবসান হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, এবং মন বলছে যে আততায়ী হলেন স্বয়ং প্রোফেসর হেক্টর ডিমেট্রিয়াস, যিনি এই একই মাউজার বন্দুক দিয়ে ক্রীট দ্বীপের সাইলোরিটি পাহাড়ের গায়ে ঝাউ বনের ভিতর সেই নাম-না-জানা ব্যাঘ্রজাতীয় লোমশ প্রাণীটিকে হত্যা করেছিলেন।

আরো বোঝা যাচ্ছে যে এই মৃত উটওয়ালার এই মৃত উটের পিঠে চড়েই ডিমেট্রিয়াস তার অভিযানে বেরিয়েছিলেন। এই পর্যন্ত এসে তাঁর বাহকের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়—তাই তাকে মেরে ফেলেন। এর পর ডিমেট্রিয়াস যেখানেই গিয়ে থাকুন, তাঁকে পায়ে হেঁটেই যেতে হয়েছে।

আমাদের উটওয়ালা দুটির দিকে চেয়ে মায়া হল। তাদের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তার কারণ যে শুধু এই হত্যার দৃশ্য, তা নয় ; কিছুক্ষণ থেকেই মাঝে মাঝে একেকটা দমকা পশ্চিমা বাতাসের সঙ্গে আবার শুনতে পাচ্ছি সেই দামামার শব্দ—দুম্—ধুপ্...দুম্—ধুপ্...দুম.....—ধুপ্... ।

বুঝতে পারলাম যে ওই আওয়াজ লক্ষ্য করেই আমাদের এগোতে হবে, এবং

সম্ভব হলে উটের পিঠেই যেতে হবে। মন এখন বলছে ওই শব্দের সঙ্গে ডিমেট্রিয়াসের একটা সম্পর্ক রয়েছে।

সামারভিলকে বলতে সে বলল, 'আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু এবার আর তুমি ভেলকি দেখাতে চেষ্টা কোরোনা ; যেভাবে ঘন ঘন বাতাস বইছে, তাতে ওই শব্দ সহজে থামবে বলে মনে হয় না। উটওয়ালারা এমনি বললে বোধহয় যেতে রাজী হবে না। দেখ যদি টাকার লোভ দেখালে কিছু হয়।'

টাকায় কাজ হল, তবে অল্পে নয়, এবং বেশ কিছুটা আগাম দিতে হল। গত তিন ঘণ্টা ওই শব্দ লক্ষ্য করে আমরা পশ্চিম দিকে এগিয়েছি। একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখে উট থামিয়ে নামতে হয়েছে। চারিদিকে ধু ধু করছে মরুভূমি, আর তার মাঝখানে স্বর্গের দিকে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা পিরামিড সদৃশ বালির ঢিপি। হাইটে গিজার পিরামিডের চেয়ে বেশি বই কম নয়।

আমরা ঢিপিটার থেকে বেশ কিছুটা দূরেই ক্যাম্প ফেলেছি। আরো কাছে গেলে হয়ত ওটার আয়তনের আরো সঠিক আন্দাজ পাবো। মরুভূমিতে আন্দাজ করা ভারী কঠিন। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে ওই বালির নিচে যদি প্রাচীন ঈজিপসীয় সভ্যতার কোনো অতিকায় নিদর্শন লুকিয়ে থাকে, তাহলে আমরাই হব তার প্রথম আবিষ্কর্তা। বালি না-সরা পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। উটওয়ালা দুটোকে জিগ্যেস করে দেখেছি। তাদের মুখে কথাই সরছে না। বোধহয় অবিরাম দামামাধ্বনিতে তাদের বাক্যরোধ হয়েছে। এখান থেকে সব সময়ই সেই গুরুগম্ভীর শব্দটা শোনা যাচ্ছে, বাতাসের উপর আর নির্ভর করছে না সেটা ! বলা যায় সে শব্দটা যেন এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশের একটা অঙ্গ। এক ঘণ্টা হল আমরা এখানে এসেছি, তার মধ্যে একবারও শব্দটা থামেনি বা তার ছন্দপতন ঘটেনি। শুনলে মনে হয় যেন শব্দটা চিরকালই ছিল, এবং চিরকালই থাকবে।

বালির পাহাড়টা সম্পর্কে সামারভিলেরও ধারণা যে ওটা আসলে একটা প্রাচীন স্তম্ভ বা মন্দির জাতীয় কিছু। আমরা ঠিক করেছি যে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে তারপর পাহাড়টার কাছে গিয়ে ওটার চারিদিকে ঘুরে ভালো করে অনুসন্ধান করব। শব্দটা সম্বন্ধে কিন্তু ওরও আমারই মতো হতভম্ব অবস্থা। তবে একটা কথা ও ঠিকই বলেছিল—শব্দটা মাটির নীচে থেকেই আসছে। আমরা বালিতে কান পেতে সেটা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। এইভাবে ক্রমাগত রাবুণে দুরমুশের শব্দে আমাদের কাজের ব্যাঘাত হতে পারে। দেখা যাক কী হয়, কপালে কী আছে !

পশ্চিমে আবার মেঘ করেছে। অল্প অল্প বাতাসও বইছে, আর তার সঙ্গে বালি।

১৮ই জানুয়ারি, বিকাল চারটা

প্রচণ্ড বালির ঝড়ে আমাদের তাঁবু প্রায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তারই মধ্যে আবার ভূমিকম্প।

কিন্তু এই কাঁপুনির মধ্যেও একটা বিশেষত্ব লক্ষ করলাম। দোলাটা সাধারণ ভূমিকম্পের মতো এপাশ ওপাশ নয়। প্রথম ধাক্কাতেই মনে হল পায়ের তলা থেকে ভূখণ্ডের খানিকটা অংশ যেন আচমকা স্থান পরিবর্তন করল, আর তার ফলে আমরা সব কিছু সমেত বেশ খানিকটা নিচের দিকে চলে গেলাম। একজন লোক চেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় তার তলা থেকে যদি সেটা হঠাৎ টেনে নেওয়া যায়, তাহলে যা হয়, এটাও ঠিক তাই। প্রচণ্ড ভূমিকম্পের সময় মাঝে মাঝে একটা ঘড় ঘড় করে শব্দ হয় সেটা আমি জানি ; আমার নিজের অভিজ্ঞতা আছে এ ব্যাপারে। কিন্তু আজকের কাঁপুনির সময় যে শব্দটা হল তেমন শব্দ আর কখনো হয়েছে কিনা জানি না। মনে হল সমস্ত পৃথিবীটা যেন জ্যান্ত হয়ে যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। আমি যে আমি, আমারও কপালে ঘাম ছুটে গিয়েছিল। মুরাদ ও সুলেমান—আমাদের দুই উটওয়ালা—দুজনেই আতঙ্কে সংজ্ঞা হারিয়েছিল। ওষুধ দেওয়ার ফলে দুজনেরই অবশ্য জ্ঞান হয়েছে, কিন্তু এরা আর কোনদিন কথা বলতে পারবে বলে মনে হয় না। উট দুটোও দেখছি একেবারে থুম মেরে গেছে। তারা আর জাবর কাটছে না, কেবল একদৃষ্টে ওই রহস্যময় পাহাড়টার দিকে চেয়ে আছে। ভূমিকম্পের চোটে পাহাড়টাও মনে হচ্ছে এক পাশে সামান্য কাত হয়ে গেছে। অবিশ্যি সেটা আমার দেখার ভুল হতে পারে। হিসেবপত্র সব কেমন জানি গুলিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র যে জিনিসটা অপরিবর্তিত রয়েছে সেটা হল ওই দুম্ দুম্ দামামাধ্বনি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যদি মনে হয় আর দুর্যোগের সম্ভাবনা নেই তাহলে আমরা দুজনে একবার বেরোব। পাহাড়টার আরেকটু কাছে না গেলে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

বিকাল সোয়া পাঁচটা

সেই অদ্ভুত মরুপর্বতের পাদদেশে বসে আবার ডায়রি লিখছি।

তাঁবু থেকে এটাকে যত উঁচু মনে করেছিলাম, কাছে এসে তার চেয়েও অনেক বেশি উঁচু মনে হচ্ছে। এখানে দামামার শব্দে কান পাতা যায় না। সামারভিল ও আমি পরস্পরের সঙ্গে হাতমুখ নেড়ে কথা বলার কাজ সারছি। তবে আশ্চর্য এই যে এহেন কর্ণপটাহবিদারক শব্দও দেখছি ক্রমে অভ্যাস হয়ে আসছে। এখন আর আগের মতো অসহ্য মনে হচ্ছে না, বা চিন্তার ব্যাঘাত হচ্ছে না।

প্রথমে পাহাড়টা কীরকম দেখতে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করি। এর পূর্বপাশটা

খাড়া উঠে গেছে উপর দিকে একেবারে চুড়ো পর্যন্ত। দূর থেকে দেখলে এটাকে একটা সমবাহু ত্রিভুজের মতো মনে হবে। চুড়ো থেকে পশ্চিম দিকে বালি নেমে এসেছে ঢালু হয়ে একেবারে জমি পর্যন্ত, যার ফলে উত্তর আর দক্ষিণে দুটো ত্রিভুজ দেয়ালের সৃষ্টি হয়েছে। একটু পাশ থেকে ছবি আঁকলে এইরকম দাঁড়াবে—

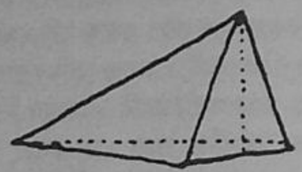

অর্থাৎ, এটাকে ঠিক পিরামিড বলা চলে না ; এর চেহারায় একটা বিশেষত্ব আছে।

তাঁবু থেকে পাহাড়ে আসার পথে দুটো আশ্চর্য জিনিস আবিষ্কার হয়েছে। সামারভিল কিছু দূরে বসে তারই একটার নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করছে। বালির উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রথম যেটা চোখে পড়ল সেটা খয়েরি রঙের দড়ির মতন একটা জিনিস। বালি থেকে যেভাবে জিনিসটা বেরিয়েছিল, তাতে প্রথমে মনে হয়েছিল সেটা বুঝি শুকিয়ে যাওয়া উদ্ভিদ্ জাতীয় একটা কিছু। কিন্তু কাছে এসে হাত দিয়ে পরখ করে বুঝলাম তা নয়। দড়ি বললেও অবিশ্যি ঠিক বলা হয় না, কারণ তার এককেটার বেড় একটা মোটা বাঁশের সমান। দুজনে অনেক টানাটানি করেও জিনিসটাকে স্থানচ্যুত করা গেল না। শেষকালে সামারভিল ছুরি দিয়ে খানিকটা অংশ কেটে সঙ্গে নিয়ে নিল পরীক্ষা করার জন্য।

যে জিনিসটা আমাদের আরো বেশি অবাক করল সেটা সম্ভবত কোনো ধাতুর তৈরি। জিনিসটার রং হালকা লাল ; দেখে মনে হয় একটা বিরাট চাকার একটা পাশের খানিকটা অংশ। এই সামান্য অংশ থেকেও চাকার আয়তনের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। হিসেবে বলছে তার পরিধি অন্তত দুশো ফুট। অর্থাৎ তার মধ্যে দিব্যি একটা আস্ত টেনিস কোর্ট ঢুকে যায়। এটাকেও অবিশ্যি হাত দিয়ে টানাটানি করে কোনো ফল হল না। এই মরুভূমির পরিবেশে এই অতিকায় ধাতবচক্র এতই অস্বাভাবিক, এবং প্রাচীন মিশরের সঙ্গে এর সম্পর্ক এতই ক্ষীণ যে, এটা আমাদের নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। তাহলে কি ডিমেট্রিয়াস সাহারার

গর্ভে একটি গবেষণাগার বা কারখানাজাতীয় কিছু স্থাপন করেছে—যার সঙ্গে এই দড়ি ও এই চাকা যুক্ত ? এবং যার যন্ত্রপাতি-কলকব্জার শব্দ বাইরে থেকে দামামার শব্দের মতো শোনাচ্ছে ? কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে এই ভূগর্ভস্থিত কারখানায় ঢোকার দরজা কোথায় ? ডিমেট্রিয়াসই বা সেখানে গেল কী করে ? আর এমন কি ভয়ঙ্কর গোপন গবেষণায় সে লিপ্ত থাকতে পারে যার জন্য সাহারার মতো জনমানবশূন্য প্রান্তরের প্রয়োজন হয় ?

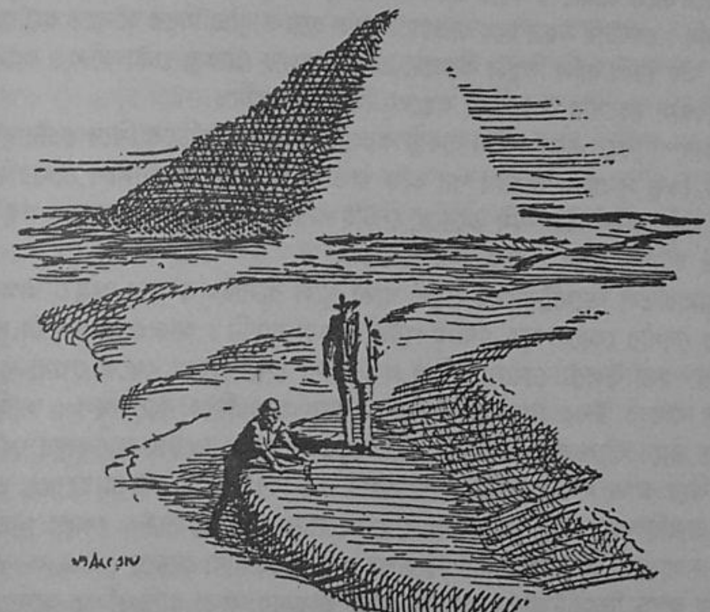

পাহাড়ের পূর্ব পাশ, অর্থাৎ যে পাশটা খাড়াই উঠে গেছে, সে পাশ থেকে মাঝে মাঝে বালি খসে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে। দেখে সন্দেহ হয় যে ভিতরটা ফাঁপা—এবং তার মধ্যে দিয়ে বায়ু চলাচলের একটা রাস্তা রয়েছে। একবার ওদিকটায় গিয়ে হাত দিয়ে বালি খুঁড়ে দেখলে কেমন হয় ?

সামারভিল তার জায়গা ছেড়ে উঠেছে। ও পুব দিকটাতেই যাচ্ছে। ওর সঙ্গে যাওয়া দরকার। একজনের যদি কিছু হয় তাহলে অন্যজনকে ভারী অসহায় হয়ে

Bdbangla.Org

পড়তে হবে।

রাত এগারোটাবেজে কুড়ি মিনিট

গত পাঁচ ঘন্টার মধ্যে অনেক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে।

প্রথমেই বলি, আমি আর সামারভিল পাহাড়ের পুবদিকটায় গিয়ে প্রায় আধঘন্টা ধরে হাত দিয়ে বালি সরিয়ে একটা গহ্বর বা সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়েছি। তার ভিতরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। তীব্র টর্চের আলো ফেলে দূরবীন দিয়ে দেখেও কূলকিনারা করা যায়নি। গহ্বরের মধ্যে থেকে ক্ষণে ক্ষণে প্রচণ্ড দমকা বাতাস বেরিয়ে এসে আমাদের কাজে রীতিমত ব্যাঘাতের সৃষ্টি করছিল। তবু আমরা হাল ছাড়িনি। শেষটায় সন্ধ্যা হয়ে যাওয়াতে বাধ্য হয়ে তাঁবুতে ফিরে আসতে হয়েছে। কাল যদি দেখি বালি কিছুটা কমেছে, তাহলে গহ্বরে ঢোকার চেষ্টা করব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রহস্যের উত্তর এই গহ্বরের ভিতরেই রয়েছে।

ক্যাম্পে ফিরে এসে কফির ব্যবস্থা করলাম। আমার বড়িতে খিদে তেষ্টা দুইই মেটে, কিন্তু সারাদিন কাজের পর কফি খাওয়ার আনন্দটা মেটে না। সামারভিল সঙ্গে কিছু ব্রেজিলিয়ান কফি এনেছে, সেটাই খাওয়া হচ্ছে। কফি সেবনের পর যে বিচিত্র ঘটনাটা ঘটল সেটার কথা বলি।

সামারভিল ডিমেট্রিয়াসের সবুজ খাতা খুলে বসেছিল। তার অদ্ভুত অক্ষরে অদ্ভুত লেখার কোনো সূত্র এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আজও আধ ঘন্টা ধরে খাতার পাতা উল্টে কোনো সুবিধা করতে না পেরে চোখ থেকে চশমা খুলে খোলা খাতার উপর রেখে সামারভিল মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল। আমিও চিন্তিত ভাবে পাশে বসে সেদিনের সেই অদ্ভুত প্যানথার জাতীয় জানোয়ার থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত একটার পর একটা যত বিদ্‌ঘুটে অভিজ্ঞতা হয়েছে তার কথা ভাবছিলাম, এমন সময় আমার চোখ পড়ল ডিমেট্রিয়াসের খোলা খাতার উপর। সামারভিলের চশমাটা তার উপর কাত করে রাখা রয়েছে। লক্ষ করলাম চশমার কাচে ডিমেট্রিয়াসের হাতের লেখা আয়নার মতো প্রতিফলিত হয়েছে। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকেই বুঝলাম সে লেখা আমি চিনতে পারছি, সে ভাষা আমার চেনা ভাষা। আর সে ভাষা গ্রীকও নয়, অন্য কিছুই নয়—একেবারে সহজ সরল ইংরিজি। এক মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

ব্যাপারটা আর কিছুই না—অন্য লোকে যাতে সহজে পড়তে না পারে তাই ডিমেট্রিয়াস ইংরিজি লিখেছে উল্‌টো করে—অর্থাৎ, ডান দিক থেকে বাঁ দিকে। একে বলে Mirror writing। এর ফলে চেনা ভাষা হয়ে যায় দুর্বোধ্য সাংকেতিক ভাষা। অথচ আয়নার সামনে ধরলে সে ভাষা পড়তে আর কোনোই অসুবিধা হয় না। মনে পড়ল ইতালীর বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চি তাঁর

নোটবুকে এই mirror writing ব্যবহার করতেন।

গত এক ঘন্টা ধরে সামারভিলের দাড়ি কামাবার আয়না সামনে রেখে আমরা ডিমেট্রিয়াসের লেখার বেশির ভাগটাই পড়ে ফেলেছি। লেখা থেকে যা জানা গেল মোটামুটি এই—

ক্রীট দ্বীপের ক্নোসস্ শহরে একটা পাঁচ হাজার বছরের পুরানো মন্দিরের ভগ্নস্তূপ থেকে ডিমেট্রিয়াস একটা পাথরে খোদাই করা লেখা পায়। সেটার মানে উদ্ধার করে সে জানতে পারে যে লেখাটা একটা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ওষুধের ফরমুলা। সে ওষুধ খেলে নাকি মানুষের শরীরে দেবতার শক্তি সঞ্চারিত হয়। ডিমেট্রিয়াস সেই ওষুধ তৈরি করার সংকল্প করেছিল, এবং লেখা পড়ে মনে হয় সফলও হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ১লা জানুয়ারি সে নাকি ফিলিক্স্ নামে একজন কাউকে সে ওষুধ খাইয়ে পরীক্ষাও করেছিল। এই ফিলিক্স্ ব্যক্তিটি যে কে সেটা কোথাও বলা নেই ; তবে সামারভিল ও আমি দুজনেই জানি ফিলিক্স মানুষের নাম হলেও, কথাটার আসল মানে হচ্ছে বেড়াল, অথবা বেড়াল শ্রেণীর কোনো প্রাণী। যেমন বাঘের ল্যাটিন নাম হল ফিলিস টাইগ্রিস। তাহলে কি···না ; আর লেখা সম্ভব নয়। বাইরে ঝড় আর তার সঙ্গে বৃষ্টি।···

২২শে জানুয়ারি···

ঘন্টা দুয়েক হল কায়রোতে পৌঁছেছি। হাত কাঁপছে, তবুও টাটকা থাকতে থাকতে গত দুদিনের বিভীষিকাময় ঘটনার কথা লিখে রাখতে চাই। একটা পুরো দিন নষ্ট হয়েছে ক্যারাভ্যানের অপেক্ষায় বসে থেকে। আমাদের উট এবং দুজন উটওয়ালাই নিখোঁজ, সম্ভবত মৃত। কাজেই আমাদের দুজনকে ক্ষত বিক্ষত অবসন্ন শরীরে বালির উপর দিয়ে প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা হেঁটে তবে ক্যারাভ্যানের রাস্তায় আসতে হয়েছিল। আমার ওষুধের গুণে ঘা শুকিয়ে এসেছে, এমনকি সামারভিলের কনুইয়ের ভাঙা হাড়ও জোড়া লেগে গেছে ; কিন্তু মনের অবস্থা মোটেই স্বাভাবিক নয়, হতেও পারে না। কী ভাগ্যি ওষুধের শিশি, ডায়রি, কলম, মানিব্যাগ, ডুপলিকেট চশমা আর অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা আমার পকেটে ছিল। বাকি সব কিছুই—এমনকি ডিমেট্রিয়াসের খাতা পর্যন্ত—কোথায় যে তলিয়ে গেছে তার কোনো পাত্তাই নেই।

১৮ই জানুয়ারি রাত এগারোটার পর তাঁবুতে বসে ডায়রি লিখতে লিখতে হঠাৎ ঝড়বৃষ্টির সূত্রপাত হল সেকথা আগেই লিখেছি। এখানে বছরে মাত্র তিনচার দিন বৃষ্টি হয় বলেই কিনা জানি না, এমন চোখ ধাঁধানো মুষলধারা ও তার সঙ্গে ঝড়ের এমন দাপট আমি কখনো দেখিনি। তাঁবুর এক পাশের ক্যানভাস হাওয়ায় ফেঁপে উঠে ঝাপটা মেরে প্রথমেই আমার আলোটাকে দিল অকেজো করে। এদিকে

বাইরে দুর্যোগের ফলে উট দুটো বিকট চিৎকার আরম্ভ করেছে ; আর মুরাদ ও সুলেমান বালি কামড়ে পড়ে তারস্বরে আল্লার নাম জপছে !

পৌনে বারোটা নাগাদ (আমার ঘড়ির কাঁটায় রেডিয়াম থাকায় কেবল সময়টাই দেখতে পাচ্ছিলাম) ঝড়ের শব্দ কমে এলো। আমাদের তাঁবু আর দাঁড়িয়ে নেই। সেটা এখন আমাদের দুজনের গায়ে আষ্টেপৃষ্টে জড়ানো, এবং আমরা প্রাণপণে সেটাকে আঁকড়ে ধরে আছি যাতে বৃষ্টি থামলে যেন আবার সেটাকে ছাউনি হিসাবে ব্যবহার করতে পারি।

ঠিক বারোটার সময়ে একটা প্রচণ্ড বিদ্যুতের চমক হল, আর সেই সঙ্গে আরম্ভ হল প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প। প্রথম ধাক্কাতেই দেখলাম আমি আর মাটিতে নেই ; এক ঝটকায় কিসে যেন আমাকে ব্যাট দিয়ে মারা ক্রিকেট বলের মতো শূন্যে তুলে ফেলেছে। এই শূন্যপথে অন্তত পাঁচ সেকেন্ড ধরে প্রচণ্ড বেগে উড়ে গিয়ে আমি সজোরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম বরফের মতো ঠাণ্ডা ভিজে বালির ওপর। আমার

মাথার উপর আর তাঁবুর আচ্ছাদন নেই, আমার পাশে সামারভিলও নেই। দুর্ভেদ্য অন্ধকার রাতে সাহারার একটা অংশে আমি একা বালিতে উপুড় হয়ে পড়ে বৃষ্টিবাণে বিদ্ধ হচ্ছি। সামারভিল কোথায়, সে বেঁচে আছে কিনা,—উট এবং উটওয়ালাগুলোই বা কোথায়, তারাই বা বেঁচে আছে কিনা, কিচ্ছু জানার উপায় নেই।

হঠাৎ আরেকটা ঝটকায় আমি আরো কিছুদূর গড়িয়ে গেলাম। তারপর ভূমি স্থির হল। ক্রমে বৃষ্টি থেমে গেল। তারপর সব চুপ, সব শব্দ বন্ধ।

কোনো শব্দই নেই ? সেই দামামা-ধ্বনি ?

না, তাও নেই। আশ্চর্য ! সেই কর্ণভেদী দুম্ দুম্ শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে। তার বদলে একটা অস্বাভাবিক শ্বাসরোধকারী নিস্তব্ধতা আমার বুকের উপর

চেপে বসেছে। কিন্তু ওই ভূগর্ভোত্থিত গুরুগম্ভীর শব্দ হঠাৎ বন্ধ হবার কারণ কী ?

মাথাটা একটু উঁচু করে চারিদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখলাম। অন্ধকার চলে গেছে। কিন্তু এত আলো হয় কী করে ? সব কিছুই এত স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে কী করে ?

হঠাৎ খেয়াল হল—আকাশ পরিষ্কার। একটা মাত্র হাল্কা টুক্‌রো মেঘ চাঁদের উপর থেকে সরে যাচ্ছে। পূর্ণিমার চাঁদ।

মেঘ সরে গেল। এখন পূর্ণ জ্যোৎস্না। এমন আশ্চর্য উজ্জ্বল চাঁদের আলো কখনো দেখিনি।

ওটা কে—ওই বাঁ দিকে, বিশ হাত দূরে ? সামারভিল না ?

হ্যাঁ, সামারভিল। সামারভিল দাঁড়িয়ে আছে। আমি হাঁক দিলাম—'আর্থার ! আর্থার !'

কোনো উত্তর নেই। সে কি কালা হয়ে গেছে ? না পাগল ? কিসের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে সে ?

আমারও দৃষ্টি সেই দিকে গেল। পাহাড়ের দিকে।

পাহাড়ের উপর থেকে বালি সরে গেছে। কিন্তু তার তলা থেকে যেটা বেরিয়েছে সেটা কী ? আর পাহাড়ের ঢালু অংশটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে তার দুদিকে ঘন জঙ্গলটা কিসের ?

আমি সামারভিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। দৃষ্টি পাহাড়ের দিক থেকে সরাতে পারছি না। অবাক বিস্ময়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, কারণ আমি ক্রমে বুঝতে পারছি যে আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে যে বিশাল জিনিসটা, সেটা আসলে আমার চেনা। আর পুব দিকের খাড়াই অংশের গায়ে যে দুটো বিরাট গহ্বর, যাকে আমরা কারখানায় যাবার সুড়ঙ্গ বলে মনে করেছিলাম—সেটাও আমার চেনা। গহ্বর দুটো আসলে নাকের ফুটো, আর পাহাড়টা একটা শুয়ে থাকা মানুষের নাক, আর নাকের ঢালু অংশটা যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, তার দুপাশে জঙ্গলটা হচ্ছে ভুরু, আর তার নিচের প্রশস্ত ঢিপিটা হচ্ছে বন্ধ হওয়া চোখ !

'ডিমেট্রিয়াস !'

সামারভিলের ফিসফিসে কণ্ঠস্বর সাহারার এই অপার্থিব জ্যোৎস্না-প্লাবিত দিগন্তবিস্তৃত নিস্তব্ধতার মধ্যে যেন প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—

'ডিমেট্রিয়াস !...ডিমেট্রিয়াস !...'

হ্যাঁ, ডিমেট্রিয়াস। ওই নাক আমি ছবিতে দেখেছি। ওই ভুরুও দেখেছি। ওই চোখ দেখেছি খোলা অবস্থায়। এখন বন্ধ, কারণ ডিমেট্রিয়াসের মৃত্যু হয়েছে। তার মুখেরই খানিকটা অংশ বেরিয়ে আছে বালির উপর, আর তার বুকের একটা অংশ। খয়েরী রঙের দড়িটা আসলে ওর গায়ের একটা লোম। আর সেই যে

জিনিসটা,যেটাকেএকটা বৃত্তের অংশ বলে মনে হয়েছিল, সেটা আসলে হাতের একটা নখ।

'ভূমিকম্পের কারণ বুঝতে পারছ ?' সামারভিল জিজ্ঞেস করল।

বললাম, 'পারছি। ডিমেট্রিয়াস মৃত্যুশয্যায় বালির নিচে ছটফট করছিল।'

'আর দামামা-ধ্বনি ?'

'ডিমেট্রিয়াসের হার্টবীট।—ডিমেট্রিয়াস তার ওষুধ প্রথমে তার বেড়াল ফিলিপ্সের উপর পরীক্ষা করে। তার ফলেই অতিকায় বেড়ালের সৃষ্টি হতে চলেছিল, ডিমেট্রিয়াস বেগতিক বুঝে তার বাড়া বন্ধ করার জন্য বন্দুকের সাহায্য নিয়েছিল।'

'কিন্তু তার নিজের বাড়াটা মাঝপথে বন্ধ হয় সেটা সে চায়নি। সে খাঁটি বৈজ্ঞানিকের মতোই জানতে চেয়েছিল তার ওষুধের দৌড় কতদূর।'

'ঠিক বলেছ। তার নিজের বিশ্বাস ছিল সে অতিকায় মানুষে পরিণত হবে, তাই তার পরীক্ষার জন্য দিগন্তহীন মরুভূমির প্রয়োজন হয়েছিল।'

'কতটা লম্বা হবে ডিমেট্রিয়াসের দেহটা সেটা আন্দাজ করে দেখেছ ?'

আমি বললাম, 'নাকের পূর্ব দিকের অংশটা যদি আন্দাজ একশো ফুট উঁচু হয় তাহলে পুরো শরীরটা অন্তত তার ষাটগুণ হওয়া উচিত।'

'অর্থাৎ ছ'হাজার ফুট।'

'অর্থাৎ এক মাইলেরও বেশি।'

সামারভিল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তাহলে বেদে বুড়ির কথা সত্যি হল !'

আমি বললাম, 'অক্ষরে অক্ষরে। আজ উনিশে জানুয়ারী। দামামাধ্বনি বন্ধ হল ঠিক রাত বারোটায় !'

* * *

দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে হল।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পেলাম। আকাশ কালো করে নিচে নেমে আসছে পঙ্গপালের মতো হাজার হাজার শকুনি। দেখে মনে হয় পৃথিবীতে যত শকুনি আছে সব একজোটে ওই ছ'হাজার ফুট লম্বা মানবদানবের শবদেহ ভক্ষণ করতে আসছে।

দৃশ্যটা দেখে ভালো লাগল না। অন্তত আমাদের চোখের সামনে এ-ঘটনা ঘটতে দেওয়া যায় না !'

আমার অ্যানাইহিলিন পিস্তলটা পকেট থেকে বার করে আকাশের দিকে তাক করে তিন সেকেণ্ড ঘোড়াটা টিপে রাখতেই দেখতে দেখতে শকুনির দল নিশ্চিহ্ন হয়ে বৃষ্টি-ধোয়া সাহারার আকাশের নীল নির্মল রূপটা আবার ফিরে এল।

কর্ভাস

১৫ই আগস্ট

পাখি সম্পর্কে কৌতূহলটা আমার অনেক দিনের। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে একটা পোষা ময়না ছিল, সেটাকে আমি একশোর উপর বাংলা শব্দ পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করতে শিখিয়েছিলাম। আমার ধারণা ছিল পাখি কথা বললেও কথার মানে বোঝে না। একবার এই ময়নাটাই এমন এক কাণ্ড করে বসল যে আমার সে ধারণা প্রায় পাল্টে গেল। দুপুরবেলা সবে মাত্র আমি ইস্কুল থেকে ফিরছি, মা রেকাবিতে মোহনভোগ এনে দিয়েছেন, এমন সময় ময়নাটা হঠাৎ 'ভূমিকম্প, ভূমিকম্প' বলে চেঁচিয়ে উঠল। আমরা কোনো কম্পন টের পাইনি, কিন্তু পরের দিন কাগজে বেরোল সিজ্‌মোগ্রাফ যন্ত্রে সত্যিই নাকি একটা মৃদু কম্পন ধরা পড়েছে।

সেই থেকে পাখিদের বুদ্ধির দৌড় সম্পর্কে মনে একটা অনুসন্ধিৎসা রয়ে গেছে, কিন্তু অন্যান্য পাঁচ রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে ওটা নিয়ে আর চর্চা করা হয়নি। আরেকটা কারণ অবিশ্যি আমার বেড়াল নিউটন। নিউটন পাখি পছন্দ করে না, আর নিউটনকে অখুশি করে আমার কিছু করতে মন চায় না। সম্প্রতি, বয়সের জন্যেই বোধহয়, নিউটন দেখছি পাখি সম্বন্ধে অনেক উদাসীন হয়ে পড়েছে। সেই কারণেই আমার ল্যাবরেটরিতে আবার কাক, চড়ুই, শালিক ঢুকতে আরম্ভ করেছে। আমি সকালে তাদের খেতে দিই। সেই খাদ্যের প্রত্যাশায় তারা সূর্য ওঠার আগে থেকেই আমার জানালার বাইরে জটলা করে।

প্রত্যেক প্রাণীরই কিছু কিছু নির্দিষ্ট সহজাত ক্ষমতা থাকে। আমার ধারণা অন্য প্রাণীর তুলনায় পাখির ক্ষমতা আরো বেশি, আরো বিস্ময়কর। একটা বাবুইয়ের বাসা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। একজন মানুষকে কিছু খড়কুটো দিয়ে যদি ওরকম একটা বাসা তৈরি করতে বলা হয়, আমার বিশ্বাস সে

Bdbangla.Org

কাজটা সে আদৌ করতে পারবে না, কিংবা যদি বা পারে তো মাসখানেকের অক্লান্ত পরিশ্রম লেগে যাবে।

অস্ট্রেলিয়াতে ম্যালি-ফাউল বলে একরকম পাখি আছে, যারা মাটিতে বাসা করে। বালি, মাটি আর উদ্ভিজ্জ দিয়ে তৈরি একটা ঢিপি, আর তার ভেতরে ঢোকার জন্য একটা গর্ত। ডিম পাড়ে বাসার ভিতরে, কিন্তু সে-ডিমে তা দেয় না। অথচ উত্তাপ না হলে তো ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবে না। উপায় কী? উপায় হল এই যে ম্যালি-ফাউল কোনো এক আশ্চর্য অজ্ঞাত কৌশলে বাসার ভিতরের তাপমাত্রা আটাত্তর ডিগ্রি ফারেনহাইটের এক ডিগ্রিও এদিক-ওদিক হতে দেয় না, তা বাইরের আবহাওয়া ঠাণ্ডা বা গরম যাই হোক না কেন।

আরো রহস্য। গ্রীব নামক পাখি তাদের নিজেদের পালক ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় এবং শাবকদের খাওয়ায়, কেন তা কেউ জানে না। আবার এই একই গ্রীব পাখি জলে ভাসমান অবস্থায় কোনো শত্রুর আগমনের ইঙ্গিত পেলে নিজের দেহ ও পালক থেকে কোনো এক অজ্ঞাত উপায়ে বায়ু বার করে দিয়ে শরীরের স্পেসিফিক গ্রাভিটি বাড়িয়ে গলা অবধি জলে ডুবে ভাসতে থাকে।

এ ছাড়া যাযাবর পাখির দিক্‌নির্ণয় ক্ষমতা, ঈগল-বাজের শিকার ক্ষমতা, শকুনের ঘ্রাণশক্তি, অসংখ্য পাখির আশ্চর্য সংগীত-প্রতিভা—এসব তো আছেই। এই কারণেই কিছুদিন থেকে পাখির পিছনে কিছুটা চিন্তা ও সময় দিতে ইচ্ছা করছে। তার সহজাত বুদ্ধির বাইরে তাকে কত দূর পর্যন্ত নতুন জিনিস শেখানো যায়? মানুষের জ্ঞান, মানুষের বুদ্ধি তার মধ্যে সঞ্চার করা যায় কি? এমন যন্ত্র কি তৈরি করা সম্ভব যার সাহায্যে এ কাজটা হতে পারে?

২০শে সেপ্টেম্বর

আমার পাখি পড়ানো যন্ত্র নিয়ে কাজ চলেছে। আমি সহজ পথে বিশ্বাসী। আমার যন্ত্রও তাই হবে জলের মতো সহজ। দুটি অংশে হবে এই যন্ত্র। একটি হবে খাঁচার মতো। পাখি থাকবে সেই খাঁচার মধ্যে। খাঁচার সঙ্গে বৈদ্যুতিক যোগ থাকবে দ্বিতীয় অংশের। এই অংশটি থেকে জ্ঞান ও বুদ্ধি চালিত হবে পাখির মস্তিষ্কে।

এই একমাস আমার ল্যাবরেটরির জানালা দিয়ে খাদ্যের লোভে যে সব পাখি এসে ঢুকেছে সেগুলোকে আমি খুব মনোযোগ দিয়ে স্টাডি করেছি। কাক, চড়ুই, শালিক ছাড়া পায়রা, ঘুঘু, টিয়া, বুলবুলি ইত্যাদিও মাঝে মাঝে আসে। সব পাখির মধ্যে একটি বিশেষ পাখি বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেটা একটা কাক। দাঁড়কাক নয়, সাধারণ কাক। কাকটা আমার চেনা হয়ে গেছে। ডান চোখের নিচে একটা সাদা ফুটকি আছে, সেটা থেকে তো চেনা যায়ই, তাছাড়া

হাবভাবও অন্য কাকের চেয়ে বেশ একটু অন্য রকম। ঠোঁটে পেনসিল নিয়ে টেবিলের উপর আঁচড় কাটতে আর কোনো পাখিকে দেখিনি। কালকে তো একটা ব্যাপারে রীতিমত হকচকিয়ে গেছি। আমি আমার যন্ত্র তৈরির কাজ করছি, এমন সময় একটা খচ্ খচ্ শব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি কাকটা একটা আধ-খোলা দেশলাইয়ের বাক্স থেকে ঠোঁট দিয়ে একটা কাঠি বার করে তার মাথাটা বাক্সের পাশটায় ঘষছে। আমি বাধ্য হয়ে হুস্ হুস্ শব্দ করে কাকটাকে নিরস্ত করলাম। কাকটা তখন উড়ে গিয়ে জানালায় বসে গলা দিয়ে দ্রুত কয়েকটা শব্দ করল যেটার সঙ্গে কাকের স্বাভাবিক কা-কা শব্দের কোনো সাদৃশ্য নেই। হঠাৎ শুনে মনে হবে যেন কাকটা বুঝি হাসছে।

যে রকম চালাক পাখি, আমার পরীক্ষার জন্য একে ব্যবহার করতে পারলেই সবচেয়ে ভালো হবে। দেখা যাক কতদূর কী হয়।

২৭শে সেপ্টেম্বর

আমার 'অরনিথন' যন্ত্র আজ তৈরি শেষ হল। কাকটা সকালেই আমার ঘরে ঢুকে পাঁউরুটি খেয়ে এ জানালা ও জানালা লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল, যন্ত্রটা টেবিলের উপর রেখে যেই তার দরজা খুলে দিলাম, অমনি কাক দিব্যি লাফাতে লাফাতে এসে তার ভিতরে ঢুকে পড়ল। এ থেকে এটাই অনুমান করা যায় যে কাকটার শেখার আগ্রহ প্রবল। প্রথমে কিছুটা ভাষা জ্ঞান হওয়া দরকার, নাহলে আমার কথা বুঝতে পারবে না; তাই সহজ বাংলা দিয়ে শুরু করেছি। আমাকে বোতাম টেপা ছাড়া আর কোনো কাজই করতে হচ্ছে না। শেখাবার বিষয় সমস্তই আগে থেকে রেকর্ড করা। বিভিন্ন চ্যানেলে বিভিন্ন বিষয়, প্রত্যেকটার আলাদা নম্বর দেওয়া। একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ করলাম—বোতামটা টিপলেই কাকটার চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গে তার নড়াচড়াও বন্ধ হয়ে যায়। কাকের মতো ছটফটে পাখির পক্ষে এটা যে কতো অস্বাভাবিক সে তো বুঝতেই পারছি।

নভেম্বর মাসে চিলির রাজধানী সানতিয়াগো শহরে সারা বিশ্বের পক্ষিবিজ্ঞানীদের একটা কনফারেনস্ আছে। মিনেসোটাতে আমার পক্ষিবিজ্ঞানী বন্ধু রিউফাস গ্রেনফেলকে একটা চিঠি লিখে দিয়েছি। যদি আমার বায়স বন্ধুটি সত্যি করে মানুষের বুদ্ধি কিছুটা আয়ত্ত করতে পারে, তাহলে ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে সম্মেলনে ডিমন্‌সট্রেশন সহ একটা বক্তৃতা দেওয়া চলতে পারে।

৪ঠা অক্টোবর

কর্ভাস হল কাক জাতীয় পাখির ল্যাটিন নাম। আমার ছাত্রটিকে আমি ওই

নামেই ডাকছি। নাম ধরে ডাকলে প্রথম দিকে আমার দিকে ফিরে ফিরে চাইত, এখন দেখছি গলা দিয়ে শব্দ করে উত্তর দেয়। এই প্রথম একটা কাককে 'কা' না বলে 'কি' বলতে শুনছি। তবে কণ্ঠস্বরের বিশেষ পরিবর্তন আমি আশা করছি না। অর্থাৎ কর্ভাসকে দিয়ে কথা বলানোচলবে না। তার বুদ্ধির পরিচয় তার কাজেই প্রকাশ পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

কর্ভাস এখন ইংরিজি শিখছে। বাইরে গিয়ে ডিমনস্ট্রেশন দিতে গেলে এই ভাষাটার প্রয়োজন হবে। ওর ট্রেনিঙের সময় হল সকাল আটটা থেকে ন'টা। দিনের বেলা বাকি সময়টা ও আমার ঘরের আশপাশেই ঘোরাফেরা করে। সন্ধ্যা হলে এখনো রোজই চলে যায় আমার বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণের আম গাছটায়।

নিউটন দেখছি কর্ভাসকে দিব্যি মেনে নিয়েছে। আজকে যে ঘটনাটা ঘটল তারপরে সম্পর্কটা বন্ধুত্বে পরিণত হলেও আশ্চর্য হব না। ব্যাপারটা ঘটল দুপুরে। নিউটন আমার আরাম কেদারাটার পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে, কর্ভাস কোথায় যেন উধাও, আমি খাতায় নোট লিখছি, এমন সময় হঠাৎ ডানার ঝটপটানি শুনে জানালার দিকে চেয়ে দেখি কর্ভাস ঘরে ঢুকেছে, তার ঠোঁটে একটি সদ্য কাটা মাছের টুক্‌রো। সে সেটাকে এনে থপ্ করে নিউটনের সামনে ফেলে দিয়ে আবার জানালায় ফিরে গিয়ে বসে ঘাড় বেঁকিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল।

গ্রেনফেল আমার চিঠির উত্তর দিয়েছে। লিখেছে সে পক্ষিবিজ্ঞানীদের সম্মেলনে আমাকে নেমন্তন্ন পাঠানোর বন্দোবস্ত করছে। আমি অবশ্যই যেন কাক সমেত যথাসময়ে সানতিয়াগোতে গিয়ে হাজির হই।

২০শে অক্টোবর

দু'সপ্তাহে অভাবনীয় প্রোগ্রেস। কর্ভাস ঠোঁটে পেনসিল নিয়ে ইংরিজি কথা আর সংখ্যা লিখছে। কাগজটাকে টেবিলের উপর ফেলে দিতে হয়, কর্ভাস তার উপর দাঁড়িয়ে লেখে। ওর নিজের নাম ইংরিজিতে লিখল— C-O-R-V-U-S। সহজ যোগ বিয়োগ করতে পারছে, ইংল্যাণ্ডের রাজধানী কী জিগ্যেস করলে লিখতে পারছে, আমার পদবী লিখতে পারছে। তিনদিন আগে মাস, বার, তারিখ শিখিয়ে দিয়েছিলাম, আজকে কী বার জিগ্যেস করাতে পরিষ্কার অক্ষরে লিখল—F-R-I-D-A-Y।

কর্ভাসের খাওয়ার ব্যাপারেও বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছি। আজ একটা পাত্রে রুটি টোস্টের টুক্‌রো আর আরেকটাতে খানিকটা পেয়ারার জেলি ওর সামনে রেখেছিলাম। ও রুটির টুক্‌রোগুলো মুখে পোরার আগে প্রতিবারই ঠোঁট দিয়ে

খানিকটা জেলি মাখিয়ে নিচ্ছিল।

২২শে অক্টোবর

কর্ভাস যে এখন সাধারণ কাকের থেকে নিজেকে আলাদা রাখতে চায়, তার স্পষ্ট প্রমাণ আজকে পেলাম। আজ দুপুরে হঠাৎ খুব বৃষ্টি হল, সঙ্গে বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত। তিনটে নাগাদ একটা কান ফাটানো বাজ পড়ার শব্দ শুনে জানালার কাছে গিয়ে দেখি আমার বাগানের বাইরের শিমুল গাছটা থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। বিকেলে বৃষ্টি থামার পর প্রচণ্ড কাকের কোলাহল। এ তল্লাটে যত কাক আছে, সব ওই মরা গাছটায় জড়ো হয়ে হল্লা করছে। আমার চাকর প্রহ্লাদকে ব্যাপারটা দেখতে পাঠালাম। সে ফিরে এসে বলল, 'বাবু, একটা কাক মরে পড়ে আছে গাছটার নিচে, তাই এত চেল্লাচেল্লি।' বুঝলাম বাজ পড়ার ফলেই কাকটার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য—কর্ভাস আমার ঘর থেকে বেরোবার কোনোরকম আগ্রহ দেখাল না। সে একমনে পেনসিল মুখে দিয়ে প্রাইম নাম্বার্স লিখে চলেছে— 2,3,5,7,11,13...

৭ই নভেম্বর

কর্ভাসকে এখন সদর্পে বৈজ্ঞানিক মহলে উপস্থিত করা চলে। পাখিকে শিখিয়ে পড়িয়ে খুঁটিনাটি ফরমাশ খাটানোর নানারকম উদাহরণ পাওয়া যায়, কিন্তু কর্ভাসের মতো এমন শিক্ষিত পাখির নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর আছে বলে আমার জানা নেই। অরনিথন যন্ত্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। অঙ্ক, জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদি সব বিষয়ই যে-সব প্রশ্নের উত্তর সংখ্যার সাহায্যে বা অল্প কয়েকটি শব্দের সাহায্যে দেওয়া যায়, কর্ভাস তা শিখে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওর মধ্যে যে জিনিসটা প্রায় আপনা থেকে জেগে উঠেছে, সেটাকে বলা চলে মানবসুলভ বুদ্ধি বা হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স—যেটার সঙ্গে পাখির কোনো সম্পর্ক নেই। উদাহরণ স্বরূপ একটা ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। সানতিয়াগো যাব বলে আজ সকালে আমার সুটকেস গোছাচ্ছিলাম। গোছানো শেষ হলে পর বাক্সের ঢাকনা বন্ধ করে পাশে ফিরে দেখি কর্ভাস সুটকেসের চাবিটা ঠোঁটে নিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছে।

কাল গ্রেনফেলের আরেকটা চিঠি পেয়েছি। ও সানতিয়াগো পৌঁছে গেছে। পক্ষিবিজ্ঞানী সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ আমার আসার পথ চেয়ে আছে। এত আগে এই সব সম্মেলনে কেবল পাখি নিয়ে বক্তৃতাই হয়েছে, জ্যান্ত পাখির সাহায্যে উদাহরণ সমেত কোনো বক্তৃতা কখনো হয়নি। গত দু'মাসের গবেষণার ফলে পাখির মস্তিষ্কের বিষয় আমি যে দুর্লভ জ্ঞান সঞ্চয় করেছি, সে সম্পর্কে একটা

প্রবন্ধ লিখছি। সেটাই সম্মেলনে হবে আমার পেপার। প্রতিবাদীর মুখ বন্ধ করার জন্য সঙ্গে থাকবে কর্ভাস।

১০ই নভেম্বর

দক্ষিণ আমেরিকা যাবার পথে প্লেনে বসে এই ডায়রি লিখছি। একটি মাত্র ঘটনাই লেখার আছে। বাড়ি থেকে যখন রওনা হব, তখন কর্ভাস হঠাৎ দেখি তার খাঁচা থেকে বার হবার জন্য ভারি ছট্‌ফট্ আরম্ভ করেছে। কী ব্যাপার বুঝতে না পেরে খাঁচার দরজা খুলে দিতেই সে সটান উড়ে গিয়ে আমার রাইটিং টেবিলে বসে ঠোঁট দিয়ে উপরের দেরাজটায় ভীষণ ব্যস্তভাবে ঠোকা মারতে আরম্ভ করল। দেরাজ খুলে দেখি আমার পাসপোর্ট-টা তার মধ্যে রয়ে গেছে।

কর্ভাসের জন্য একটা নতুন ধরনের খাঁচা বানিয়ে নিয়েছি। যে আবহাওয়া কর্ভাসের পক্ষে সবচেয়ে আরামদায়ক, খাঁচার ভিতর কৃত্রিম উপায়ে সেই আবহাওয়া বজায় রাখার ব্যবস্থা করেছি। খাবার জন্য কাকের পক্ষে পুষ্টিকর ভিটামিন দিয়ে হোমিওপ্যাথিক বড়ির মতো মুখরোচক বড়ি তৈরি করে নিয়েছি।

প্লেনের যাত্রীদের মধ্যে কেউই বোধহয় এর আগে কখনো পোষা কাক দেখেনি। কর্ভাস তাই সকলেরই কৌতূহল উদ্রেক করছে। তবে আমি আমার কাকের বিশেষত্ব সম্পর্কে কাউকে কিছু বলিনি। ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাই অনুমান করেই বোধহয় কর্ভাসও সাধারণ কাকের মতোই ব্যবহার করছে।

১৪ই নভেম্বর

হোটেল এক্সেলসিয়র, সানতিয়াগো। রাত এগারোটা। দু'দিন খুব ব্যস্ত ছিলাম তাই ডায়রি লেখার সময় পাইনি। আগে আমার বক্তৃতার কথাটা বলে নিই, তারপর এই কিছুক্ষণ আগের চাঞ্চল্যকর ঘটনায় আসা যাবে। এক কথায় বলা যায়, কর্ভাস-সহ আমার বক্তৃতাটা হয়েছে—অ্যানাদার ফেদার ইন মাই ক্যাপ। লেখাটা পড়তে লেগেছিল আধ ঘণ্টা, তারপর কর্ভাসকে নিয়ে ডিমন্‌স্ট্রেশন চলল এক ঘণ্টার উপর। আমি মঞ্চে উঠেই কর্ভাসকে খাঁচা থেকে বার করে টেবিলের উপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। প্রকাণ্ড লম্বা মেহগনির টেবিল, তার পিছনে লাইন করে সম্মেলনের কর্তৃপক্ষরা বসেছেন, আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনে আমার প্রবন্ধ পড়ছি। পড়া যতক্ষণ চলল ততক্ষণ কর্ভাস এক পাও নড়েনি। তার এক পাশে ঘাড় কাত করার ভঙ্গি ও মাঝে মাঝে মাথার উপর নিচ করা থেকে মনে হচ্ছিল সে গভীর মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছে এবং কথা বুঝতেও পারছে। বক্তৃতা শেষ হবার পর চারিদিক থেকে করধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে একটা কাঠঠোকরার মতো শব্দ শুনে টেবিলের দিকে চেয়ে দেখি কর্ভাস তার ঠোঁট

দিয়ে হাততালির সঙ্গে তাল মিলিয়ে টেবিলের উপর ঠুকে চলেছে।

ডিমন্‌স্ট্রেশনের সময় অবিশ্যি কর্ভাসের কোনো বিরাম ছিল না। গত দু'মাসে সে যা কিছু শিখেছে সবই সম্মেলনের অভ্যাগতদের সামনে উপস্থিত করে তাঁদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছে যে পাখির মস্তিষ্কে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি যে এভাবে প্রবেশ করতে পারে তা কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। এখানকার কাগজ কোরিয়েরে দেল সানতিয়াগোর সান্ধ্য সংস্করণে এর মধ্যেই কর্ভাসের খবর বেরিয়ে গেছে। শুধু বেরিয়েছে নয়, প্রথম পাতার প্রধান খবর হিসেবে বেরিয়েছে, আর তার সঙ্গে বেরিয়েছে পেনসিল মুখে কর্ভাসের একটা ছবি।

মিটিং-এর পর গ্রেনফেল ও সম্মেলনের চেয়ারম্যান সিনিয়র কোভারুবিয়াসের সঙ্গে সানতিয়াগো শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম। জনবহুল মনোরম আধুনিক শহর, পুবদিকে আন্ডিজ পর্বতশ্রেণী চিলি ও আরজেনটিনার মধ্যে প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ঘণ্টাখানেক ঘোরার পর কোভারুবিয়াস বললেন, 'সম্মেলনের প্রোগ্রামে দেখে থাকবে অতিথিদের জন্য আমরা নানা রকম আমোদপ্রমোদের আয়োজন করেছি। তার মধ্যে আজ বিকেলের ব্যাপারটায় আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করছি। একটি চিলিয়ান জাদুকর আজ তামাশা দেখাবেন তোমাদের খাতিরে। ইনি আর্গাস নামে পরিচিত। এঁর বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, ইনি ম্যাজিকে নানারকম পাখি ব্যবহার করেন।'

ব্যাপারটা শুনে কৌতূহল হয়েছিল, তাই আমি আর গ্রেনফেল আজ বিকেলে এখানকার প্লাজা থিয়েটারে আর্গাসের ম্যাজিক দেখতে গিয়েছিলাম। লোকটা নানারকম পাখি ব্যবহার করে সেটা ঠিকই। হাঁস, কাকাতুয়া, পায়রা, মোরগ, একটা তিন হাত লম্বা সারস, এক ঝাঁক হামিং বার্ড—এ সবই কাজে লাগায় আর্গাস এবং বোঝাই যায় যে সব ক'টি পাখিকেই সে বেশ দক্ষতার সঙ্গে কাজ শিখিয়ে নিয়েছে। বলাবাহুল্য, এই কাজের কোনোটাই আমার কর্ভাসের কৃতিত্বের ধারে কাছেও আসে না। সত্যি বলতে কী পাখির চেয়ে আমার অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং মনে হ'ল জাদুকর ব্যক্তিটিকে। টিয়া পাখির মতো নাক, মাঝখানে সিঁথি করা টান করে পিছনে আঁচড়ানো নতুন গ্রামোফোন রেকরডের মতো চকচকে চুল, চোখে মাইনাস পাওয়ারের চশমা, তার কাঁচ এত পুরু যে মণি দুটোকে তীক্ষ্ণ বিন্দুর মতো দেখায়। লম্বায় লোকটা ছ' ফুটের উপর। চক্‌চকে কালো কোটের আস্তিনের ভিতর থেকে দুটো শীর্ণ ফ্যাকাসে হাত বেরিয়ে আছে, সেই হাতের বিভিন্ন ভঙ্গিমাই দর্শকদের সম্মোহিত করে রাখে। জাদু খুব উঁচুদরের না হলেও, জাদুকরের চেহারা ও হাবভাব দেখেই প্রায় পয়সা উঠে আসে। আমি শো দেখে হল থেকে বেরোবার সময় গ্রেনফেলকে পরিহাসচ্ছলে বললাম,

'আমাদের যেমন আর্গাসের ম্যাজিক দেখানো হল, আর্গাসকে তেমনি কর্ভাসের খেলা দেখাতে পারলে মন্দ হত না।'

রাত নটায় ডিনার ও তারপরে অতি উপাদেয় চিলিয়ান কফি খেয়ে গ্রেনফেলের সঙ্গে হোটেলের বাগানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে সবেমাত্র ঘরে এসে বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়েছি, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। আমি একটু অবাক হয়ে অন্ধকারেই রিসিভারটা তুলে কানে দিলাম।

'সিনিয়র শঙ্কু ?'

'হ্যাঁ—'

'আমি রিসেপ্‌শন থেকে বলছি। আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চাইছি। একটি ভদ্রলোক বিশেষ করে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

আমি বাধ্য হয়েই বললাম যে আমি ক্লান্ত, সুতরাং ভদ্রলোক যদি কাল সকালে আমাকে টেলিফোন করে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারেন তাহলে ভালো হয়। নিশ্চয়ই কোনো রিপোর্টার হবে। এর মধ্যেই চারজন সাংবাদিককে ইনটারভিউ দিতে হয়েছে এবং তারা যে সব প্রশ্ন করেছে তাতে আমার মতো ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষকেও রীতিমত অসহিষ্ণু হয়ে পড়তে হয়। একজন সরাসরি জিগ্যেস করলেন ভারতবর্ষে যেমন গরুকে পুজো করা হয়, তেমনি কাককেও হয় কিনা।

রিসেপশন লোকটির সঙ্গে কথা বলে বলল, 'সিনিয়র শঙ্কু, ভদ্রলোক বলছেন তিনি পাঁচ মিনিটের বেশি সময় নেবেন না। সকালে ওঁর একটা অন্য এনগেজমেন্ট রয়েছে।'

বললাম, 'যিনি এসেছেন তিনি কি সংবাদপত্রের লোক ?'

'আজ্ঞে, না। ইনি হলেন বিখ্যাত চিলিয়ান জাদুকর আর্গাস।'

নামটা শুনে বাধ্য হয়েই ভদ্রলোককে উপরে আসতে বলতে হল। বিছানার পাশের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিলাম। তিন মিনিট পরে কলিং বেল বেজে উঠল।

দরজা খুলে যাকে সামনে দেখলাম তাকে স্টেজে ছ' ফুট বলে মনে হয়েছিল, এখন বুঝলাম তিনি সাড়ে ছ' ফুটেরও বেশি লম্বা। সত্যি বলতে কী, এত লম্বা মানুষ এর আগে আমি কখনো দেখিনি। বিলিতি কায়দায় সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে নমস্কার জানাবার সময়ও তিনি আমার চেয়ে প্রায় ছ' ইঞ্চি লম্বা রয়ে গেলেন। ভদ্রলোককে ঘরে আসতে বললাম। স্টেজের পোশাক ছেড়ে জাদুকর এখন সাধারণ সুট পরে এসেছেন, তবে এ সুটের রঙও কালো। ঘরে ঢোকার পর লক্ষ করলাম কোটের পকেটে কোরিয়েরে দেল সানতিয়াগোর সান্ধ্য সংস্করণ। আর্গাস চেয়ারে বসার পর তার ম্যাজিকের তারিফ করে বললাম, 'যতদূর মনে

পড়ছে, গ্রীক উপকথায় আর্গাস নামক একজন কীর্তিমান পুরুষের কথা পড়েছি যার সর্বাঙ্গে ছিল সহস্র চোখ। একজন জাদুকরের পক্ষে নামটা বেশ মানানসই।'

আর্গাস মৃদু হেসে বললেন, 'সেই কীর্তিমান পুরুষটির সঙ্গে পাখির একটা সম্পর্ক রয়েছে মনে পড়ছে নিশ্চয়ই।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। গ্রীক দেবী হেরা আর্গাসের চোখগুলি তুলে ময়ূরের পুচ্ছে বসিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকেই ময়ূরের লেজে চাকা চাকা দাগ। কিন্তু আমার কৌতূহল হচ্ছে আপনার চোখ সম্পর্কে। কত পাওয়ার আপনার চশমার ?'

'মাইনাস কুড়ি। তবে তাতে কিছু এসে যায় না। আমার পাখিগুলোর কোনোটারই চশমার প্রয়োজন হয় না।'

নিজের রসিকতায় নিজেই অট্টহাস্য করে উঠলেন আর্গাস। কিন্তু সে হাসি ফুরোবার আগেই ভদ্রলোক হঠাৎ মুখ হাঁ অবস্থাতেই থেকে গেলেন। তাঁর চোখ চলে গেছে আমার ঘরের তাকে রাখা প্লাস্টিকের খাঁচাটার দিকে। কর্ভাস ঘুমিয়ে পড়েছিল ; এখন দেখছি জাদুকরের অট্টহাসিতেই বোধহয় তার ঘুমটা ভেঙে গেছে। সে দিব্যি ড্যাব ড্যাব করে চেয়ে আছে আগন্তুকটির দিকে।

আর্গাস মুখ হাঁ অবস্থাতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে খাঁচাটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর মিনিটখানেক ধরে কর্ভাসের দিকে চেয়ে বললেন, 'আজ সন্ধ্যার কাগজে এর বিষয় পড়ে অবধি আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। আপনার বক্তৃতা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি পক্ষিবিজ্ঞানী নই, কিন্তু আমিও পাখিদের শিক্ষা দিয়ে থাকি।'

ভদ্রলোক চিন্তিতভাবে ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন। তারপর বললেন, 'বেশ বুঝতে পারছি আপনি ক্লান্ত, কিন্তু তাও অনুরোধ করছি—যদি আপনার এই পাখিটিকে একবার খাঁচা থেকে বার করতে পারেন…একবার যদি ওর বুদ্ধির একটু নমুনা…'

আমি বললাম, 'শুধু আমিই ক্লান্ত নই, আমার পাখিও ক্লান্ত। আমার খাঁচার দরজা খুলে দিচ্ছি। বাকিটা নির্ভর করবে আমার পাখির মেজাজের উপর। আমি ওকে জোর করে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করাতে চাই না।'

'বেশ তো—তাই হোক্…'

খাঁচার দরজা খুলে দিলাম। কর্ভাস বেরিয়ে এসে ডানার তিন ঝাপটায় আমার খাটের পাশে টেবিলটায় এসে এক অব্যর্থ ঠোকরে ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল।

ঘর এখন অন্ধকার। জানালা দিয়ে রাস্তার উল্টোদিকে হোটেল মেট্রোপোলের জ্বলা-নেভা সবুজ নিয়নের ফিকে আলো ঘরে প্রবেশ করছে। আমি চুপ। কর্ভাস ডানা ঝটপটিয়ে ফিরে গিয়ে খাঁচায় ঢুকে ঠোঁট দিয়ে টেনে দরজা বন্ধ করে দিল।

আর্গাসের মুখের উপর সবুজ আলো নিয়নের তালে তালে জ্বলছে, নিভছে।

Bdbangla.Org

তার সোনার চশমার পুরু কাচের ভিতর সাপের মতো চোখ সবুজ আলোয় আরো বেশি সাপের মতো মনে হচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছি সে অবাক, হতভম্ব। বেশ বুঝতে পারছি কর্ভাস ঘরের বাতি নিভিয়ে তার মনের যে ভাবটা প্রকাশ করল সেটা আর্গাসের বুঝতে বাকি নেই। কর্ভাস এখন বিশ্রাম চাইছে। সে চায় না ঘরে আলো জ্বলে। সে অন্ধকার চায়, অন্ধকারে ঘুমোতে চায়।

আর আর্গাস? তার সরু গোঁফের নিচে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটা ফিস্‌ফিসে শব্দ উচ্চারিত হল—'ম্যানিফিকো!'—অর্থাৎ চমক্‌প্রদ, অসামান্য। সে তার হাত দুটো যেন তালির ভঙ্গিতে থুতনির সামনে এনে জড়ো করেছে। লক্ষ করলাম তার নখগুলো অস্বাভাবিক রকম লম্বা ও চক্‌চকে। বুঝলাম সে নখে নেল পালিশ মেখেছে। রুপোলি পালিশ। তার ফলে মঞ্চের স্পট লাইটে আঙুলের খেলা জমে ভালো। সেই রুপোলি নখে এখন বার বার বাইরের সবুজ নিয়নের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে।

'আই ওয়ান্ট দ্যাট ক্রো!'

ফিসফিসে শুক্‌নো গলায় ইংরিজিতে আর্গাসের কথা এল। এতক্ষণ সে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলছিল আমার সঙ্গে। কথাগুলো লিখতে গিয়ে বুঝতে পারছি তাতে একটা নগ্ন নির্লজ্জ লোভের ইঙ্গিত এসে পড়ছে, কিন্তু আসলে আর্গাসের কণ্ঠস্বরে ছিল অনুনয়।

'আই ওয়ান্ট দ্যাট ক্রো!'—আবার বলল আর্গাস।

আমি চুপ করে তার দিকে চেয়ে রইলাম। এখন কিছু বলার দরকার নেই। আরো কী বলতে চায় লোকটা দেখা যাক।

আর্গাস এতক্ষণ জানালার দিকে চেয়ে ছিল। এবার সে আমার দিকে দৃষ্টি ফেরাল। ভারি অদ্ভুত লাগছিল এই অন্ধকার আর সবুজ আলোর খেলা। এও যেন একটা ভেলকি। লোকটা এই আছে, এই নেই।

আর্গাসের লম্বা আঙুলগুলো নড়েচড়ে উঠল। সেগুলো এখন তার নিজের দিকে ইঙ্গিত করছে।

'আমাকে দেখ প্রোফেসর। আমি আর্গাস। আমি বিশ্বের সেরা জাদুকর। দুই আমেরিকার প্রতিটি শহরের প্রতিটি জাদুপ্রিয় লোক আমাকে চেনে। ছেলে, বুড়ো, মেয়ে, পুরুষ সবাই চেনে। আগামী মাসে আমি পৃথিবী ভ্রমণে বেরোচ্ছি। রোম, ম্যাড্রিড, প্যারিস, লন্ডন, অ্যাথেন্স, স্টকহোল্‌ম, টোকিও, হংকং···। আমার ক্ষমতা এবার স্বীকৃত হবে সারা বিশ্বে। কিন্তু আমার চমকপ্রদ ম্যাজিক আরো সহস্র গুণে বেশি চমকপ্রদ হবে—কীসে জান? ইফ আই গেট দ্যাট ক্রো—দ্যাট ইন্ডিয়ান ক্রো! ওই পাখি আমার চাই প্রোফেসর—ওই পাখি আমার চাই···আমার চাই···আমার চাই···'

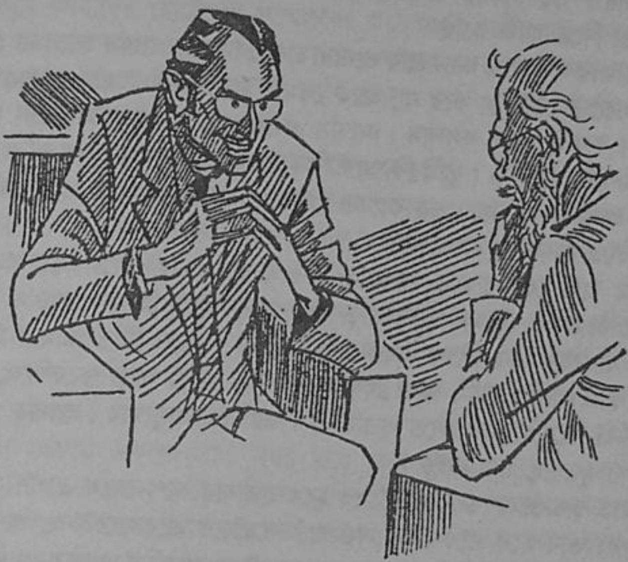

আর্গাস তার ফিস্‌ফিসে কথার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতটা আমার চোখের সামনে নাড়ছে, আঙুলগুলোকে সাপের ফণার মতো দোলাচ্ছে, নখগুলো সবুজ আলোয় চক্‌চক্ করছে। আমি মনে মনে হাসলাম। আমার জায়গায় অন্য যে কোনো লোক হলে আর্গাসের কার্যসিদ্ধি হত। অর্থাৎ সে লোক হিপ্‌নোটাইজ্‌ড হত, সেই সুযোগে খাঁচার পাখিও আর্গাসের হস্তগত হত। আমাকে হিপ্‌নোটাইজ করা যে সহজ নয় সেটা আমার কথা থেকেই বোধহয় জাদুকর বুঝতে পারলো।

'মিস্টার আর্গাস, আপনি বৃথা বাক্য ব্যয় করছেন। আর আমাকে সম্মোহিত করার চেষ্টাও বৃথা। আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কর্ভাস শুধু আমার ছাত্রই নয়, সে আমার সন্তানের মতো, সে আমার বন্ধু, আমার অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার—'

'প্রোফেসর!'—আর্গাসের কণ্ঠস্বর আগের চেয়ে অনেক তীব্র। কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার গলা নামিয়ে বলে চলল, 'প্রোফেসর, তুমি কি জান যে আমি ক্রোড়পতি? শহরের পূর্ব প্রান্তে আমার একটা পঞ্চাশ কামরাবিশিষ্ট প্রাসাদ রয়েছে সেটা কি তুমি জান? আমার বাড়িতে ছাব্বিশজন চাকর, আমার চারটে ক্যাডিলাক গাড়ি—এ সব কি তুমি জান? খরচের তোয়াক্কা আমি করি না,

প্রোফেসর। ওই পাখির জন্য তোমাকে আমি আজই, এক্ষুনি, দশ হাজার এসকুডো দিতে রাজি আছি।'

দশ হাজার এসকুডো মানে প্রায় পনেরো হাজার টাকা। আর্গাস জানে না যে সে যেমন খরচের তোয়াক্কা করে না, আমি তেমনি টাকা জিনিসটারই তোয়াক্কা করি না। সে কথাটা তাকে বললাম। আর্গাস এবার একটা শেষ চেষ্টা করল।

'তুমি তো ভারতীয়। তুমি কি অলৌকিক যোগাযোগে বিশ্বাস কর না ? ভেবে দেখ—আর্গাস—কর্ভাস ! ওই কাকের নামকরণ হয়েছে আমারই জন্য সেটা কি তুমি বুঝতে পারছ না, প্রোফেসর ?'

আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বললাম, 'মিস্টার আর্গাস—তোমার গাড়ি বাড়ি খ্যাতি অর্থ নিয়ে তুমি থাক, কর্ভাস আমার কাছেই থাকবে। ওর শিক্ষা এখনো শেষ হয়নি। ওকে নিয়ে আমার এখনো অনেক কাজ বাকি। আমি আজ ক্লান্ত। তুমি পাঁচ মিনিট সময় চেয়েছিলে, আমি বিশ মিনিট দিয়েছি, আর দিতে পারছি না। আমি এখন ঘুমোব। আমার পাখিও ঘুমোবে। সুতরাং, গুড নাইট।'

আমার কথাগুলো শুনে আর্গাসের মুখে হতাশার ছাপ দেখে একটা সামান্য অনুকম্পার ভাব মনে প্রবেশ করলেও আমি সেটাকে একেবারেই আমল দিলাম না। আর্গাস আবার বিলিতি কায়দায় মাথা নুইয়ে স্প্যানিশ ভাষায় গুড নাইট জানিয়ে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে খাঁচার কাছে গিয়ে দেখি কর্ভাস এখনো জেগে আছে। আমি যেতেই সে ঠোঁট ফাঁক করে একটা শব্দ উচ্চারণ করল 'কে' এবং শব্দটাতে যে একটা জিজ্ঞাসা রয়েছে সেটা তার বলার সুরেই স্পষ্ট।

বললাম, 'এক পাগলা জাদুকর। টাকার গরমটা বড্ড বেশি। তোমাকে চাইতে এসেছিল, আমি না করে দিয়েছি। সুতরাং তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পার।'

১৬ই নভেম্বর

ভেবেছিলাম কালকের ঘটনা, কালকেই লিখে রাখব, কিন্তু বিভীষিকার ঘোর কাটতে সারা রাত লেগে গেল।

কাল সকালটা যেভাবে শুরু হয়েছিল, তাতে বিপদের কোনো পূর্বাভাস ছিল না। সকালে সম্মেলনের বৈঠক ছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে জাপানী পক্ষিবিজ্ঞানী তোমাসাকা মোরিমোতোর ঘোর ক্লান্তিকর ভাষণ। সঙ্গে কর্ভাসকে নিয়ে গিয়েছিলাম। প্রায় এক ঘন্টা বক্তৃতার পর হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলে মোরিমোতো আমতা আমতা করছিল, এমন সময় কর্ভাস হঠাৎ আমার চেয়ারের হাতলে সশব্দে ঠোঁটতালি আরম্ভ করে দিল। হলের লোক তাতে হো হো করে

হেসে ওঠাতে আমি ভারী অপ্রস্তুতে পড়ে গিয়েছিলাম।

দুপুরে আমাদের হোটেলেই সম্মেলনের কয়েকজন ডেলিগেটের সঙ্গে লাঞ্চ ছিল। সেখানে যাবার আগে আমি আমার একাত্তর নম্বর ঘরে এসে কর্ভাসকে খাঁচায় রেখে খাবার দিয়ে বললাম, 'তুমি থাক। আমি খেয়ে আসছি।' বাধ্য কর্ভাস কোনো আপত্তি করল না।

লাঞ্চ শেষ করে যখন ওপরে এসেছি তখন আড়াইটে। দরজায় চাবি লাগাতেই বুঝলাম সেটার প্রয়োজন হবে না, কারণ দরজা খোলা। মুহূর্তের মধ্যে একটা চরম বিপদের আশঙ্কা আমার রক্ত জল করে দিল। ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে দেখি—যা ভেবেছিলাম তাই। খাঁচা সমেত কর্ভাস উধাও।

আবার ঝড়ের মতো ঘরের বাইরে এলাম। উত্তরদিকে দুটো ঘর পরেই বাঁদিকে রুম-বয়দের ঘর। উর্ধ্বশ্বাসে সে ঘরে গিয়ে দেখি দুটো রুম-বয়ই পাশাপাশি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চোখের চাহনি দেখতেই বুঝতে পারলাম তাদের দুজনকেই হিপ্‌নোটাইজ করা হয়েছে।

চলে গেলাম একশো সাত নম্বর ঘরে গ্রেনফেলের কাছে। তাকে সমস্ত ব্যাপারটা বলে দুজন সটান গিয়ে হাজির হলাম একতলার রিসেপশনে। রিসেপশন ক্লার্ক বলল, 'আমাদের কাছ থেকে কেউ আপনার ঘরের চাবি চাইতে আসেনি। ডুপলিকেট চাবি রুম-বয়দের কাছে থাকে, তারা যদি দিয়ে থাকে।'

রুম-বয়দের অবিশ্যি দেওয়ার দরকার হয়নি। আর্গাস তাদের জাদুবলে অকেজো করে দিয়ে নিজেই চাবি নিয়ে তার কাজ হাসিল করেছে।

শেষটায় হোটেলের দ্বাররক্ষকের কাছে গিয়ে আসল খবর পাওয়া গেল। সে বলল, আধ ঘন্টা আগে একটা সিল্‌ভার ক্যাডিলাক গাড়িতে আর্গাস এসেছিলেন। তার দশ মিনিট পরে হাতে একটা সেলোফেনের ব্যাগ নিয়ে তিনি হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে চলে যান।

রুপোলি রঙের ক্যাডিলাক। কিন্তু এখান থেকে কোথায় গেছে আর্গাস ? তার বাড়িতে কি ? না অন্য কোথাও ?

অবশেষে কোভারুবিয়াসের শরণাপন্ন হতে হল। ভদ্রলোক বললেন, 'আর্গাসের বাড়ি কোথায় সেটা এক্ষুনি জেনে দিতে পারি, কিন্তু তাতে কি লাভ হবে ? সে কি আর বাড়িতে গেছে ? সে তোমার কর্ভাসকে নিয়ে নিশ্চয়ই অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। তবে সে যদি শহরের বাইরে বেরোতে যায় তাহলে একটাই রাস্তা আছে। তোমাদের আমি ভালো গাড়ি, ভালো ড্রাইভার আর সঙ্গে পুলিশ দিতে পারি। সময় কিন্তু খুব কম। আধ ঘন্টার মধ্যে বেরিয়ে পড়। হাইওয়ে ধরে চলে যাবে। যদি কপালে থাকে তো তার সন্ধান পাবে।'

সোয়া তিনটের মধ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। রওনা হবার আগে হোটেল

থেকে ফোন করে জেনে নিয়েছিলাম যে আর্গাস (আসল নাম দোমিন্‌গো বার্তোলেমে সারমিয়েন্‌তো) তার বাড়িতে ফেরেনি। আমাদের সঙ্গে দুজন সশস্ত্র পুলিশ, আমরা পুলিশের গাড়িতেই চলেছি। দুজন পুলিশের একজন—ছোক্‌রা বয়স, নাম কারেরাস—দেখলাম আর্গাস সম্বন্ধে বেশ খবর-টবর রাখে। বলল, সানতিয়াগো এবং আশেপাশে আর্গাসের নাকি একাধিক আস্তানা আছে। এককালে জিপসিদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছে। উনিশ বছর বয়স থেকে ম্যাজিক দেখাতে আরম্ভ করেছে। পাখি নিয়ে ম্যাজিক শুরু করেছে বছর চারেক আগে, আর সেই থেকেই ওর জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরু করেছে।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'ও কি সত্যিই ক্রোড়পতি ?'

কারেরাস বলল, 'তাই তো মনে হয়। তবে লোকটা ভয়ানক কঞ্জুস, আর কাউকে বিশ্বাস করে না। তাই ওর বন্ধু বলতে এখন আর বিশেষ কেউ নেই।'

শহর থেকে বেরিয়ে হাইওয়েতে পড়ে একটা মুশকিল হল। হাইওয়ে দুভাগে ভাগ হয়ে একটা চলে গেছে উত্তরে লস্ আনডিজের দিকে, আরেকটা চলে গেছে পশ্চিমে ভালপারাইজো বন্দর পর্যন্ত। দুটো হাইওয়ের মুখের কাছে একটা পেট্রোলের দোকান। দোকানের লোকটাকে জিগ্যেস করাতেই সে বলল, 'ক্যাডিলাক ? সিনিয়র আর্গাসের ক্যাডিলাক ? সে তো গেছে ভালপারাইজোর রাস্তায়।'

আমাদের কালো মারসেডিস তীরবেগে রওনা দিল ভালপারাইজোর উদ্দেশে। কর্ভাসের প্রাণহানি হবে না সেটা জানি, কারণ তার প্রতি আর্গাসের লোভটা খাঁটি। কিন্তু কাল রাত্রে কর্ভাসের হাবভাব দেখেই বুঝেছিলাম যে সে জাদুকর লোকটিকে মোটেই পছন্দ করছে না। সুতরাং আর্গাসের খপ্পরে পড়ে তার যে মনের অবস্থা কী হবে সেটা ভাবতেই খারাপ লাগছে।

পথে আরো দুটো পেট্রোল স্টেশন পড়ল, এবং দুটোরই মালিকের সঙ্গে কথা বলে আমরা নিশ্চিত হলাম যে আর্গাসের সিলভার ক্যাডিলাক এই রাস্তা দিয়েই গেছে।

আমি আশাবাদী লোক।নানান সময় নানান সংকট থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এসেছি। আজ পর্যন্ত আমার কোনো অভিযানই ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু আমার পাশে বসে গ্রেনফেল ঘন ঘন মাথা নাড়ছে আর বলছে, 'ভুলে যেও না শঙ্কু—তুমি একজন অত্যন্ত ধূর্ত লোকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছ। তোমার কর্ভাসকে সে যখন একবার হাতে পেয়েছে, তখন সে পাখি তুমি সহজে ফিরে পাবে না এটা জেনে রেখ।'

কারেরাস বলল, 'সিনিয়র আর্গাসের হাতে কিন্তু অস্ত্র থাকার সম্ভাবনা। এককালে তার অনেক ম্যাজিকে তাকে আসল রিভলভার ব্যবহার করতে

দেখেছি।'

হাইওয়ে ক্রমে ঢালু নামছে। সানতিয়াগো ষোল শ ফুট থেকে এখন আমরা হাজারে নেমে এসেছি। পিছনে দূরে পর্বতশ্রেণী ক্রমে ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে আসছে। চল্লিশ মাইল পথ এসেছি, আরো চল্লিশ মাইল গেলে ভালপারাইজো। গ্রেনফেলের বেজার মুখ আমার আশার প্রাচীরে বার বার আঘাত করে তাকে টলিয়ে দিচ্ছে। হাইওয়েতে কিছু না পেলে শহরে গিয়ে পড়তে হবে। তখন আর্গাস-এর অনুসন্ধান আরো সহস্র গুণ বেশি কঠিন হয়ে পড়বে।

রাস্তা সামনে খানিকটা চড়াই উঠে গেছে। পিছনে কী আছে দেখা যাচ্ছে না। গাড়ি এগিয়ে চলেছে দুর্বার গতিতে। চড়াই পেরোল। সামনে রাস্তা ঢালু নেমে গেছে বহুদূর। রাস্তার পাশে এখানে ওখানে দু-একটা গাছ। বহুদূরে একটা গ্রাম। মাঠে মোষের দল। জনমানবের কোনো চিহ্ন নেই। কিন্তু সামনে ওটা কী ? এখনো বেশ দূর। সিকি মাইল তো হবেই।

এখন চারশো গজের বেশি নয়। একটা গাড়ি। রোদে ঝলমল করছে। রাস্তার এক পাশে বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে একটা গাছের গুঁড়ি।

এবার কাছে এসে পড়েছে গাড়িটা।

ক্যাডিলাক গাড়ি। সিলভার ক্যাডিলাক।

আমাদের মারসেডিস তার পাশে এসে দাঁড়াল। গাড়িটা কেন থেমে আছে তার কারণটা এবার বুঝলাম। রাস্তার এক পাশে ছিট্‌কে গিয়ে সেটা একটা গাছের গুঁড়িতে মেরেছে ধাক্কা। গাড়ির সামনের অংশ গেছে থেঁতলে।

কারেরাস বলল, 'সিনিয়র আর্গাসের গাড়ি। এছাড়া আরেকটা সিলভার ক্যাডিলাক আছে সানতিয়াগোতে। ব্যাঙ্কার সিনিয়র গাল্‌দামেসের গাড়ি। কিন্তু এটার নম্বর আমার চেনা।'

গাড়ি তো রয়েছে, কিন্তু আর্গাস কোথায় ?

আর আমার কর্ভাসই বা কোথায় ?

ড্রাইভারের পাশের সীটে ওটা কী ?

জানালা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে দেখলাম সেটা কর্ভাসের খাঁচা। দরজার চাবি আমারই তৈরি, আর সেটা রয়েছে আমারই পকেটে। আজ দুপুরে দরজায় চাবি দিইনি, শুধু ছিটকিনিটাই লাগানো। কর্ভাস খাঁচা থেকে নিজেই বেরিয়েছে সন্দেহ নেই ; কিন্তু তারপরে ?

হঠাৎ একটা চিৎকার কানে এল। দূর থেকে। মানুষের গলা।

কারেরাস ও অন্য পুলিশটি বন্দুক উঁচিয়ে তৈরি। আমাদের ড্রাইভার দেখলাম ভীতু লোক। সে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে মেরি মাতার নাম জপ করতে শুরু করেছে। গ্রেনফেল ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ম্যাজিশিয়ান জাতটা আমাকে বড্ড

আনকাম্‌ফারটেব্‌ল করে তোলে।' আমি বললাম, 'তুমি বরং আমাদের গাড়ির ভিতরে গিয়ে বোস।'

চিৎকারটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। রাস্তার বাঁ দিক থেকে। কিছু দূরে কতগুলো ঝোপড়া। দু-একটা বড় বড় গাছও রয়েছে। সেই দিক থেকেই আসছে চিৎকারটা। কাল রাত্রে ফিস্‌ফিসে গলা শুনেছি, তাই চিনতে দেরি হল। এ গলা আর্গাসের। অকথ্য অশ্রাব্য স্প্যানিশে সে গাল দিয়ে চলেছে। কার উদ্দেশে? ডেভিল বা শয়তানের স্প্যানিশ প্রতিশব্দটা বার কয়েক কানে এল, আর তার সঙ্গে কর্ভাসের নামটা।

'কোথায় গেল সে শয়তান পাখি? কর্ভাস! কর্ভাস! মূর্খ পাখি! শয়তান পাখি! নরকবাস আছে তোমার কপালে। নরকবাস!'—

আর্গাসের কথা আচমকা থেমে গেল—কারণ সে আমাদের দেখতে পেয়েছে। আমরাও দেখতে পাচ্ছি তাকে। তার দু' হাতে দুটো রিভলভার। একশো হাত দূরে একটা ঝোপড়ার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে।

কারেরাস হুঙ্কার দিয়ে উঠল, 'সিনিয়র আর্গাস, তোমার অস্ত্র নামাও, নইলে—'

একটা কর্ণপটহবিদারক শব্দে আমাদের মারসেডিসের দরজায় একটা রিভলভারের গুলি এসে লাগল। তারপর আরো তিনটে গুলির শব্দ। এদিকে ওদিকে আমাদের মাথার উপর দিয়ে ছট্‌কে বেরিয়ে গেল সেগুলি। কারেরাস দৃপ্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'সিনিয়র আর্গাস, আমাদের কাছে বন্দুক রয়েছে। আমরা পুলিশ। আপনি যদি রিভলভার না ফেলে দেন, তবে আমরা আপনাকে জখম করতে বাধ্য হব।'

'জখম?' আর্গাস শুকনো গলায় আর্তনাদ করে উঠল। 'তোমরা পুলিশ? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!'

আর্গাস এখন পঁচিশ হাতের মধ্যে। এইবার বুঝলাম তার দশাটা। তার চশমাটি খোওয়া যাওয়াতে সে প্রায় অন্ধের সামিল হয়ে পড়ে যত্রতত্র গুলি চালিয়েছে।

আর্গাস হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে এলো। কারেরাস ও অন্য পুলিশটি তার দিকে এগিয়ে গেল। আমি জানি এ সংকটে আর্গাসের কোনো ভেলকিই কাজ করবে না। তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কারেরাস এগিয়ে গিয়ে মাটি থেকে রিভলভার দুটো তুলে নিল। আর্গাস তখন বলছে, 'সে পাখি উধাও হয়ে গেল! দ্যাট ইনডিয়ান ক্রো! শয়তান পাখি···কিন্তু কী অসামান্য তার বুদ্ধি!'

গ্রেনফেল কিছুক্ষণ থেকে ফিস্‌ফিস্ করে কী যেন বলতে চেষ্টা করছিল, এবারে তার কথাটা বুঝতে পারলাম।

'শঙ্কু—দ্যাট বার্ড ইজ হিয়ার।'

কী রকম? কোথায় কর্ভাস? আমি তো দেখছি না তাকে!

গ্রেনফেল রাস্তার উল্টোদিকে নেড়া অ্যাকেসিয়া গাছটার মাথার দিকে আঙুল দেখাল।

উপরে চেয়ে দেখলাম—সত্যিই তো—আমার বন্ধু, আমার শিষ্য, আমার প্রিয় কর্ভাস গাছটার সবচেয়ে উঁচু ডালে বসে নিশ্চিন্তভাবে আমাদের দিকে ঘাড় নিচু করে দেখছে।

তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতেই সে অক্লেশে গোঁত খাওয়া ঘুড়ির মতো গাছের মাথা থেকে নেমে এসে বসল আমাদের মারসেডিসের ছাদের উপর। তারপর অতি সন্তর্পণে—যেন জিনিসটার মূল্য সে ভালোভাবেই জানে—তার ঠোঁট থেকে তার সামনেই নামিয়ে রাখল আর্গাসের মাইনাস বিশ পাওয়ারের সোনার চশমাটা।

Bdbangla.Org